রাত্রি

"বনফুল"

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

রাত্রির কথা লিখতে বসেছি।

এখন কিন্তু বৈশাখের প্রখর দ্বিপ্রহর, রোদের তাতে প্রকৃতি পুড়ে যাচ্ছে ; মনে হচ্ছে, সকাল থেকে ক্রমাগত আত্মসম্বরণ ক'রে ক'রে প্রকৃতি যেন শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আর পারছে না, অন্তরের পুঞ্জীভূত উত্তাপ চতুর্দিক চৌচির ক'রে দিয়ে এইবার ফেটে বেরোয় বুঝি। নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ নিষ্ঠুর উত্তাপ। একটা তৃষ্ণার্ত কাক অশ্বত্থগাছের ডালে হাঁ ক'রে ব'সে আছে, গলার কাছটা কাঁপছে তার। বুড়ো অশ্বত্থগাছটার সর্বাঙ্গে কচি পাতার সমারোহ, নীরবে একটা সবুজ অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে যেন। ঠাকুর-বাড়ির গেটটার পাশে সারি সারি গোটা-তিনেক কলসী নিয়ে কইলু ব'সে আছে—ফতুয়া-পরা ন্যাড়া-মাথা কইলু, কলসী থেকে জল নিয়ে তৃষ্ণার্ত পথিকদের বিনামূল্যে দান করছে দৈনিক চার আনা মজুরির পরিবর্তে। কার পুণ্য হচ্ছে, কে জানে! অদূরে বুড়ো মুচীটাও ব'সে আছে আশেপাশে নানাজাতীয় ছিন্ন পাদুকা ও পাদুকা-সংস্কারের সরঞ্জাম নিয়ে। বুড়োর লক্ষ্য পথিকদের পায়ের ওপর, মাঝে মাঝে নিজের দিকে কারও কারও দৃষ্টিও আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে সে—'জুতিঠো হুজুর!' কেউ তার কথায় কর্ণপাত করছে না ; এই রোদে দাঁড়িয়ে জুতো সারাবে

কে! বুড়ো কিন্তু নিরস্ত হচ্ছে না, সুযোগ পেলেই অনুরোধ করছে। তার মানসপটে ██████ জাঁদরেল মুচিনীটার মুখচ্ছবি ভেসে উঠছে বোধ হয়, বিকেলে সে আসবে, পাই-পয়সার হিসেব নেবে এবং উপার্জন কম হ'লে কারণে অকারণে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করবে। আর্তনাদ করতে করতে একটা মোটর ছুটে চ'লে গেল, ধূলো উড়ল। তার পেছনে একটা জীর্ণ টমটম, ঘোড়াটা জীর্ণতর, চারজন মোটা লোককে আর যেন বেচারা টানতে পারছে না, গাড়োয়ান ঘন ঘন চাবুক চালাচ্ছে। ঘন ঘন হর্ন দিতে দিতে আর একটা মোটর বেরিয়ে গেল, আবার একরাশ ধূলো উড়ল। 'ঠাণ্ডা মালাই-বরো-ফ'—ভীষণদর্শন একটা লোক ছাতা মাথায় দিয়ে হেঁকে বেড়াচ্ছে, তার পেছনে একজন কুলী, তার মাথায় লাল শালু দিয়ে মোড়া মালাই-বরফের হাঁড়ি। পিচের রাস্তা গরম হয়ে নরম হয়ে এসেছে। কুলীটার পায়ের চামড়া শক্ত, ফাটা-ফাটা, হয়তো গরম লাগছে না। ঠাণ্ডা মালাই-বরফ ব'য়ে বেড়াবার জন্যে ক পয়সা পাবে ও, কে জানে! অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ব'সে রাত্রির কথা লিখছি, মনে ক'রে ক'রে ভেবে ভেবে লিখছি। এই দারুণ দ্বিপ্রহরের পটভূমিকায় নিবিড় রাত্রির স্মৃতি অস্পষ্ট, রহস্যময়।

খট-খট-খট-খট-খট-খট।

মদগর্বিত পদবিক্ষেপে একদল পুলিস-বাহিনী রাস্তা

প্রকম্পিত ক'রে চ'লে গেল। ওদের খাকী সাজ আর লাল পাগড়ি আশ্চর্য রকম মানিয়েছে উদ্ধত দ্বিপ্রহরের নিদারুণ এই···

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, অশ্বত্থগাছের সবুজ পাতাগুলো হাসছে। ওই পুলিসবাহিনীর একটি পুলিসকে চিনতে পেরে আমারও হাসি পাচ্ছে। কালই আভূমি নত হয়ে ও সেলাম করছিল ট্যাঁস-ফিরিঙ্গী এক গার্ড-সাহেবকে আকবরনগর স্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে, আমি দেখেছিলাম। খট-খট-খট-খট-খট-খট—মদগর্বিত পদধ্বনি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল। বুড়ো মুচীটা সভয়ে চেয়ে রইল, জলসত্র-পরিচালক কইলু একজন তৃষ্ণার্ত পথিকের আঁজলায় জল ঢালতে ঢালতে অন্যমনস্ক হয়ে মাটিতেই ঢেলে দিলে খানিকটা জল।

এই বিক্ষেপ-বিক্ষোভ-উত্তাপ-বৈচিত্র্যের মধ্যে ব'সেই লিখতে হচ্ছে রাত্রির কথা। তিমিরময়ী নক্ষত্রখচিত রাত্রি। নক্ষত্র অগণিত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদও উঠেছিল মধ্যরাত্রে। ঝড়ও উঠেছিল। আমি সবটা দেখি নি, দেখলেও হয়তো হৃদয়ঙ্গম করতে পারতাম না। না, আমি সবটা দেখি নি, দেখতে পারি নি; অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। যখন জেগে উঠলাম, দেখলাম, প্রভাত হয়েছে।

২

জীবনের যে অনিবার্য ঘটনাগুলিকে অপছন্দ করি আমি, আশ্চর্যের বিষয়, সেই অপ্রীতিকর ঘটনাগুলিরই সহায়তায় তার

সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সেদিন। সেদিন কি বার ছিল, কি মাস ছিল, কি তিথি ছিল, কিছুই মনে নেই। মনে থাকবার কথাও নয়। শুধু মনে আছে, দগদগে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের ডোরা-কাটা শতরঞ্চিটা প্ল্যাট্‌ফর্মে পেতে তার ওপর বেকুবের মত ব'সে ছিলাম আমি। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। অস্বস্তি আরও প্রবল হয়ে উঠল, যখন একজন কুলী এসে মাথার ওপর একটা আলো জ্বেলে দিয়ে গেল। অস্পষ্ট আর কিছু রইল না। শতরঞ্চি শতকণ্ঠে আত্মপ্রচার করতে লাগল, আমার প্রকাণ্ড কালো তোরঙ্গটার ওপর সাদা রঙ দিয়ে লেখা আমার নামটা অগোচর রইল না আর কারও।

স্ত্রীবিহীন পুরুষকে চাকরের ওপর নির্ভর করতে হয়—সে-ই সখী, সচিব, গৃহিণী সব—বিশেষত আমাব মত কাছাখোলা লোককে, যার নিজের হাতে এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাওয়াব সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। সেই চাকর যদি আবার আমার গোকুল-চন্দ্রের মত যুগপৎ রসবোধলেশহীন, কর্মঠ, বিশ্বাসী এবং স্নেহশীল হয়, তা হ'লে এই রঙচঙে শতরঞ্চির ওপর বেকুবের মত ব'সে অস্বস্তি ভোগ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ট্রেন ছাড়বার মিনিট-দশেক আগে হন্তদন্ত গোকুল এই শতরঞ্চিটা কিনে স্টেশনে দিয়ে গেল আমাকে, সকাতরে অনুরোধ ক'রে গেল, বিছানাটা যেন না খুলি, এই শতরঞ্চিটা পেতেই যেন চালিয়ে দিই ভ্রমণকালীন শোয়া-বসাটা। গোকুল জানে, বিছানায় টুকিটাকি নানা রকম জিনিস আছে, খুললেই একটা না একটা

হারিয়ে যাবে। গোকুলকে অমান্য করবার শক্তি আমার নেই। কিন্তু ভগবান গোকুলকে আর একটু যদি—রসিক নয়, কম বেরসিক ক'রে সৃষ্টি করতেন, কি ক্ষতি হ'ত তাতে তাঁর? আশ্চর্য কাণ্ড, পয়সা দিয়ে শতরঞ্জিবেশী এই প্রলাপটা কিনে নিয়ে এসেছে ও সজ্ঞানে, স্বচ্ছন্দে! কিছুদিন পূর্বে এই বেখাপ্পা রকম বড় কালো রঙের তোরঙ্গটাও এই গোকুলই কিনেছিল, সাদা রঙ দিয়ে নাম গোকুলই লিখিয়েছে। শুধু তোরঙ্গে নয়, আমার সমস্ত জিনিসে—বাসন-কোসন, জামা-কাপড়, বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর, গেঞ্জি, লুঙ্গি, সমস্ত জিনিসে আমার নাম লেখা এবং সমস্তই আমার হিতৈষী গোকুলের কীর্তি। গোকুল আমাকে নিয়ে সর্বদাই সন্ত্রস্ত। আমি যেন সমস্ত জিনিস হারিয়ে ফেলতে উদ্যত, নাম-টাম লিখে গোকুল কোনক্রমে সামলে-সুমলে রেখেছে সব যেন।

ওয়েটিং-রুমের পাশে অন্ধকার এক কোণে রঙিন শতরঞ্জিটার ওপর চুপ ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলাম আমার আষ্টেপৃষ্ঠে মজবুত ক'রে বাঁধা বিছানার বাণ্ডিলটায় হেলান দিয়ে। অদূরে একটা এঞ্জিন শব্দ করছিল—শ্‌শ্‌শ্‌শ্‌। চোখ বুজে শুয়ে একটা গল্পের প্লট ভাবছিলাম। একটু নমুনা দিই।—

…চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকার। অরণ্যসমাকুল উপত্যকার সমস্ত সৌন্দর্য অমাবস্যার অন্ধকারে অবলুপ্তপ্রায়। নির্মেঘ আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছায়াপথ প্রসারিত। সুবিশাল বৃশ্চিকরাশি বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্নের

মত চিরন্তন প্রশ্নের রহস্য লইয়া অন্ধকার শূন্যে জ্বলিতেছে। দূরসন্নিবদ্ধ দেবদারুশীর্ষে অনুরাধা, তাহার ঈষৎ নিম্নে জ্যেষ্ঠা, এবং শূলপাণি-পর্বতের অগ্রভাগে মূলা নক্ষত্র দেদীপ্যমান। নক্ষত্রের মৃদু আলোকে অন্ধকার ঈষৎ স্বচ্ছ, ঘনসন্নিবদ্ধ বনশ্রেণী পর্বতগাত্রে পুঞ্জীভূত মেঘবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। শূলপাণি ও পার্বতীর মধ্যস্থিত বনসমাচ্ছন্ন এই উপত্যকায় বৌদ্ধ কাপালিক রক্তভিক্ষু সঙ্গোপনে বাস করেন। উপত্যকা শ্বাপদ-সঙ্কুল, গভীর নিবিড় রাত্রেও নীরব নহে। নিকটে দূরে বন্য পশুর সাবধান-সঞ্চরণ-শব্দ, অজগর-নিষ্পিষ্ট অসহায় পশুর অবরুদ্ধ আর্তনাদের মত একটা প্রচ্ছন্ন ধ্বনি, জটিল শাখা-প্রশাখাময় বৃক্ষশীর্ষে নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন···

ঘর্ঘর ক'রে একটা শব্দ হ'ল, চোখ খুলে দেখলাম, ঠিক মাথার ওপরে যে বাতিটা টাঙানো ছিল, একটা কুলী হাতল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেটা নাবাচ্ছে। একটু পরেই আলো জ্ব'লে উঠল এবং আমাকে কেন্দ্র ক'রে গোকুলের কীর্তি সকলের প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠল। রঙিন শতরঞ্জি, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে উঠে বসলাম, এবং টাইম্‌টেব্‌লটা নিয়ে আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতাটার ওপর অকারণে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। ওতেই নিমগ্ন হয়ে রইলাম খানিকক্ষণ। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং—স্টেশনের ভেতরে ঘণ্টা বাজল। কে একজন আপ-ডাউন ভাষায় আর এক স্টেশনের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন। কথা শেষ হয়ে গেল। এঞ্জিনের সোঁ-সোঁ আওয়াজটা আবার

স্পষ্ট হয়ে উঠল। কেন জানি না, আউধ-রোহিলখণ্ড লাইনের পাতা থেকে চোখ তুলে হঠাৎ আমি ডান দিকে ফিরে চাইলাম, মনে হ'ল, কে যেন আমায় ঘাড় ধ'রে ফিরিয়ে দিলে। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর হঠাৎ দেখতে পেলাম—হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ওয়েটিং-রূমের দরজার ফাঁক দিয়ে কালো কুচকুচে একজোড়া চোখ আমার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। আর কিছু নয়, কেবল একজোড়া চোখ।

রাত্রি।

আমার রঙিন শতরঞ্চি এবং নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটার সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে লজ্জিত হয়ে ওঠবার পূর্বেই, বেশ মনে পড়ছে, বংশী এসে ঢুকল ওয়েটিং-রূমে এক ঠোঙা খাবার এবং এক কুঁজো জল নিয়ে। তারপর কয়েক মিনিট কি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। এইটুকু শুধু মনে আছে, এঞ্জিনের সোঁ-সোঁ শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল, এবং আমি সহসা আবার প্রাণপণে সেই অন্ধকার উপত্যকায় নিশাচর পক্ষীর পক্ষ-বিধুনন অনুসরণ ক'রে সেই বৌদ্ধ কাপালিকের অলৌকিক কাহিনীটা গ'ড়ে তোলবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগলাম।

আপনিই কি বিখ্যাত গল্পলেখক ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার?

প্রশ্ন করলে বংশী, কিন্তু ঈষদুন্মুক্ত দরজার অন্তরালে শাড়ির টকটকে লাল পাড়ের ঝলক চোখে পড়ল। বুঝলাম, বংশী প্রশ্নকারক নয়, প্রশ্নবাহক।

কি রকম যেন বেকায়দায় প'ড়ে গেলাম।

'ঘনশ্যাম' নামটা এ যুগের সভ্য-সমাজে অচল, যে রগরগে শতরঞ্চিটার ওপর ব'সে আছি সেটা অচল, নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা অচল, এবং সর্বাপেক্ষা অচল আমার ব্রণ-লাঞ্ছিত-মুখ-সর্বস্ব এই রোগা লম্বা চেহারাটা। বাইরের এই জিনিস-গুলোর সঙ্গে আমার অন্তর্লোকের সুন্দর সাহিত্য-সাধনাকে বিজড়িত করতে বরাবরই আমি একটু সঙ্কুচিত হই। তবু সম্ভবত 'বিখ্যাত' শব্দটাব মোহে অভিভূত হয়ে বংশীকে সত্য কথাই বললাম।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপনি ডাক্তারি করতে করতে কি ক'রে লেখেন এত ?

বুঝলাম, এ প্রশ্নটি বংশীর মস্তিষ্ক থেকে স্বতঃ উৎসারিত হ'ল। একটু মুচকি হাসলাম। আমাব মুচকি হাসির অন্তরালে কি পরিমাণ উষ্মা নিহিত ছিল, তা দেখতে পেলে বংশী একটু বিব্রত হ'ত। অনেকেই এ প্রশ্ন কবে। কিন্তু কি মূর্খের মত প্রশ্ন! এ যেন অনেকটা 'আপনি ডাক্তারি করতে কবতে নিশ্বাস নেন কি ক'রে'-জাতীয় প্রশ্ন। অনেকেই দেখেছি আলাপ শুরু কবেন প্রশ্ন দিয়ে। দু-চারটে সাধাবণ প্রশ্নেব পব অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রকম ব্যক্তিগত সব প্রশ্ন বর্ষিত হতে থাকে। 'মাসে কত টাকা উপায় করেন'—এ প্রশ্ন তো অনেকের মুখেই শুনেছি। 'প্র্যাকটিস কেমন হচ্ছে', 'লেখা থেকে দু-পয়সা হচ্ছে কি না'—এত বাব এত লোকের কাছে শুনেছি যে, গা-সওয়া হয়ে গেছে। আর এক-জাতীয় সাহিত্যিক প্রষ্টা আছেন, তাঁদের প্রশ্নগুলো বেশ জটিল

ধরনের। 'ছোটগল্প কি ক'রে লিখতে হয়', 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তফাত কোথায়', 'সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম শ্রেণীর কবি কি না', 'বাংলা সাহিত্যে কোন্ কবি ব্রাউনিঙের মত', 'জীবনের অবিকল প্রতিচ্ছবিই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য কি না'—দিশাহারা হয়ে পড়তে হয়।

বংশী শতরঞ্জিতে উপবেশন ক'রে তৃতীয় প্রশ্নটা করলে এবং আত্মপ্রকাশ করলে।

আচ্ছা, আজকাল চারিদিকে 'ফ্রয়েড ফ্রয়েড' খুব শুনি, লোকটা কে বলুন তো?

আমি একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলাম, ডিটেক্টিভ।

শিস দেবার ভঙ্গীতে মুখটা কুঁচকে বিস্মিত বংশী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু পারলে না, ভেতর থেকে ডাক এল।

বংশীদা, শুনুন।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে—যেন আকাশের ওপার থেকে—কথাগুলো ভেসে এল। রাত্রির সম্পর্কে বরাবরই, এমন কি শেষ পর্যন্ত, আমার এই দূরত্ববোধক অনুভূতিটা ঘোচে নি।

উঠে চ'লে গেল বংশী।

আমি ব'সে রইলাম চুপ ক'রে। এঞ্জিনের সোঁ-সোঁ শব্দটা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। কিছু একটা করবার জন্যেই সম্ভবত স্টেশনের ঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, একটা কাগজ সাঁটা রয়েছে। ঘড়ি চলছে না। সংস্কৃত ভাষায় গল্পের যে প্লটটা ভাবছিলাম, সেটাই আবার ভাববার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজে

আবার ঠেস দিয়ে শুলাম বিছানার বাণ্ডিলটায়। শূলপাণি এবং পার্বতী পর্বতের মধ্যস্থিত উপত্যকার সে ছবিটা আর কিন্তু মনের মধ্যে তেমন ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠল না। বংশী মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগল, আর সেই কালো কুচকুচে চোখ দুটো, সেই লাল পাড়ের ঝলকানি। তখন ভাবি নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওই শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার উপত্যকার সঙ্গে কালো কুচকুচে চোখ দুটো, লাল পাড়ের ঝলকানি আর বংশীর অতি নিবিড় যোগ ছিল। না থাকলে ঠিক সেই সময় রক্তভিক্ষু নামে একটি কাপালিকের কথা আমার মনে হবে কেন? সেই অন্ধকার উপত্যকায় শূলপাণি-পর্বতের গুহায় রক্তভিক্ষু নামে যে বৌদ্ধ কাপালিককে আমি ক্ষণিকের জন্য কল্পনা করেছিলাম, সে যদিও আর কোন দিন আমার লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করবে না, সে যদিও হারিয়ে গেল, তবু কিন্তু ঠিক সেই সময় সে আমার কল্পনাতেই বা মূর্ত হয়েছিল কেন, যদি না—

স্বর্ণেন্দু ব'লে কাউকে চেনেন আপনি?

চোখ খুলে উঠে বসলাম।

বংশী আবার এসেছে।

স্বর্ণেন্দু?

হ্যাঁ, স্বর্ণেন্দু রায়, স্কটিশে আপনার সঙ্গে—

আর বলতে হ'ল না, যবনিকা উঠে গেল, চোখের সামনে ভেসে উঠল স্বর্ণেন্দুর মুখখানা। কালো রোগা লাজুক স্বর্ণেন্দু। 'সোনার চাঁদ' ব'লে রাগাতাম তাকে আমরা।

খুব চিনি। কেউ হয় নাকি স্বর্ণেন্দু আপনার?

আমার পিসতুতো দাদা।

ও।

সোনাদা এসে পড়বেন এখুনি দিল্লী এক্সপ্রেসে। আমরা সবাই মধুপুর যাচ্ছি।

বেড়াতে?

না, চেঞ্জে। পিসেমশায়ের অসুখ।

কি হয়েছে?

ডাক্তারী কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলাম না।

পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাতের শ্লীল অশ্লীল নানা রকম কারণ মাথার মধ্যে ভিড় ক'রে এল।

আশ্চর্য আমাদের মন!

কতদিন থেকে?

এক বছর হবে। কথা পর্যন্ত বলতে পারেন না একেবারে।

কোথায় রয়েছেন তিনি, ওয়েটিং-রুমে?

হ্যাঁ, আসুন না, দেখবেন?

খুব সম্ভবত একজন লেখকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যেই, ইংরেজীতে যাকে বলে 'কাঁধ-ঘষাঘষি') বংশী আমাকে ভেতরে যেতে বললে।

না থাক্, হয়তো ঘুমুচ্ছেন এখন।

ঘুমুবেন কি, ঘুমই হয় না তাঁর, দিনরাত জেগে আছেন।

অচেতন নয়, সচেতন মনেরই প্রত্যক্ষলোকে কালো কুচকুচে চোখ দুটো নির্নিমেষে চেয়ে ছিল। আকর্ষণ করছিল, বিকর্ষণও করছিল। স্বর্ণেন্দুর কে হয় ও?…হয়তো দু মিনিট কেটেছিল, হয়তো দু ঘণ্টা, ঘড়ির দিক থেকে ভেবে দেখবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন। এইটুকু শুধু মনে আছে, অনেকক্ষণ লেগেছিল কুণ্ঠাটা কাটতে—বেশ কিছুক্ষণ। চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। চোখের দৃষ্টিতে সাজপোশাকবর্জিত আসল মানুষটিকে চেনা যায়—মনের গহনলোকে সঙ্গোপনে যে মানুষটি বাস করে তাকে, সামাজিক নয়, ব্যক্তিগত আসল সত্তাটিকে। সাজে পোশাকে আলাপে ব্যবহারে সভ্য-জগতের সব মানুষই প্রায় এক ছাঁদের। চোখের দৃষ্টিই মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে এখনও। চোখের দৃষ্টিই মুখশ্রীর প্রাণ। অদ্ভুত ওই কালো চোখ দুটি! বিশিষ্ট! হয়তো ওর সঙ্গে জীবনে কখনও পরিচয় ঘটত না। আমার বর্ণবহুল শতরঞ্জি, ডাক্তার ঘনশ্যাম রায় নাম-লেখা তোরঙ্গ, ডাক্তারি-সাহিত্যিকতার আপাতঅদ্ভুতত্ব নিয়ে আলোচনা—অর্থাৎ যে জিনিসগুলো আমি অপছন্দ করি, সেই জিনিসগুলিরই আকস্মিক সমন্বয় না ঘটলে সেদিন, কিংবা কোন দিনই হয়তো, তার সঙ্গে পরিচয় ঘটত না আমার। তার কথা-গুলো—প্রায় বছর দুয়েক আগে শোনা কথাগুলো, মনে পড়ছে আমার।

আপনার ওই শতরঞ্জিটাই প্রথমে চোখে পড়েছিল আমার,

তারপর দেখলাম নাম-লেখা তোরঙ্গটা। নামটা দেখেই মনে পড়ল, দাদার এই নামেরই তো একজন ডাক্তার লেখক বন্ধু আছেন। বংশীদাকে বললাম—

আশ্চর্য রকম ছোকরা এই বংশী, অর্থাৎ আশ্চর্য রকম লোক-ঠকানো চেহারা ওর! প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, চালাক-চতুর বেশ। চেহারাতে এমন একটা লালিত্য আছে, অর্থাৎ সেই ধরনের লালিত্য আছে, যা আজকালকার মেয়েদের পছন্দ। বৃষস্কন্ধ ব্যূঢ়োরস্ক নয়, বেশ রোগা-রোগা, পাঞ্জাবি-পরলে-বেশ-মানায়-গোছ চেহারা। মুখে যে হাসিটা সর্বদাই চিকমিক করছে, আপাতদৃষ্টিতে হঠাৎ সেটা বুদ্ধির দীপ্তি ব'লে ভুল হবার সম্ভাবনা। প্রতি কথাতেই সমঝদার-মার্কা হাসি। সেই হাসির অন্তঃসার-শূন্যতা কিন্তু নিমেষে বোঝা যায় চোখ দুটোর পানে চাইলে। সর্বদা চঞ্চল চোখ দুটোর দৃষ্টি ছটফট করছে—যেন নিজেকে ঢাকবার জন্যে, ধরা পড়ার ভয়ে, কিন্তু পারছে না। নির্বোধ, ভীরু, লোলুপ, চঞ্চল দৃষ্টি।

আসুন না, দেখবেন?

আবার অনুরোধ করলে বংশী।

চলুন।

৩

আলোটা উসকে দাও, ঘনশ্যামবাবু এসেছেন।

আলোটা উজ্জ্বলতর হতেই অনিবার্যভাবে তাকেই প্রথমে

দেখলাম, যদিও সে কোণের দিকে ব'সে ছিল। আলোটা উসকে দিলে চাকরটা।

বর্ণনা করবার চেষ্টা করব না। অক্ষমতা নয়। রঙচঙে কথার আতসবাজি ছুটিয়ে, শব্দের ঝঙ্কারে সকলকে দিশাহারা ক'রে দিয়ে পরিশেষে 'অবর্ণনীয়' ব'লে অক্ষমতা জ্ঞাপন করবার কৌশল আমার খুব আয়ত্ত আছে। এ ক্ষেত্রে সে কৌশল প্রয়োগ করতে বিরত হলাম, কারণ আমি কিছুই অতিরঞ্জিত করতে চাই না। ঔপন্যাসিকী কায়দায় বর্ণনা করতে বসলে অতিরঞ্জন অবশ্যম্ভাবী। অতি সংক্ষেপে কেবল কিছু বলছি, যদিও তাও, খুব সম্ভব, 'অতি' না হ'লেও ঈষৎ-রঞ্জিত হয়ে যাবেই।

ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, কালো রঙ। এমন কালো সাধারণত দেখা যায় না। মিশ কালো, কুচকুচে কালো প্রভৃতি কালো-রঙ-প্রকাশক বিশেষণগুলি দিয়ে এ কালো রঙের বর্ণনা করা যাবে না। কারণ তার রঙে শুধু কালিমা নয়, কোমলতাও ছিল—মখমলের মত অদ্ভুত একটা কোমলতা। অতি পেলব, অতি মৃদু, অতি আশ্চর্য একটা শ্রী ওই কালো রঙেব নিবিড়তায় আবিষ্ট হয়ে স্বপ্ন দেখছিল যেন। কুচকুচে কালো চোখ দুটো আরও অদ্ভুত—চঞ্চল নয়, নিষ্পলক। যখন যতটুকু দেখে, নির্নিমেষে দেখে, যার দিকে চেয়ে থাকে, তাকে বিদ্ধ করছে তত মনে হয় না, যত মনে হয় নিঃশেষ করছে—মনে হয়, তার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব যেন দেখতে পাচ্ছে ও। প্রথমেই তাকে

দেখে আমার এত কথা মনে হয় নি, এই বর্ণনাটুকু আমি আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে সঙ্কলন ক'রে দিলাম। প্রথমেই তাকে দেখে আমার মনে যে ধারণা হয়েছিল, প্রথম দৃষ্টিতেই সে রকম ধারণা করতে পারে কেবল বাঙালী-সন্তান। যদিও সে একটিও কথা বলে নি, তবু সহসা আমার মনে হ'ল, মেয়েটা জ্যাঠা, ইংরেজীতে যাকে বলে 'প্রিকোশাস'। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করলে এই দাঁড়ায় যে, তাকে বয়সের আন্দাজে বেশি বুদ্ধিমতী ব'লে মনে হয়েছিল। বয়সের আন্দাজে! তার বয়স কত—সে আন্দাজ করতে পেরেছিলাম কি? আঠারো কি আটাশ—সে প্রশ্নই তো মনে জাগে নি তখন। কার জাগে? অনেকদিন পরে বংশী যখন নিমোনিয়ার ঘোরে প্রলাপ বকছিল—"তোমার বয়স কত তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি"—মনে পড়ছে, এই প্রলাপের সঙ্গে আমার মতের মিল ছিল। বংশীর প্রলাপের চিকিৎসা অবশ্য করেছিলাম ডাক্তার আমি, কিন্তু কবি আমি সায় দিয়েছিলাম ওই প্রলাপের সঙ্গে। পুরুষের মনকে যে নারী প্রবলভাবে নাড়া দেয়, তার নারীত্বের বেশি আর কিছু জানবার আগ্রহ থাকে না মনের। তার বয়স কত, তার ওজন কত—নিরতিশয় অবান্তর প্রসঙ্গ এসব; অনভিভূত মনের বস্তুতান্ত্রিক কৌতূহল। প্রথম দর্শনেই তাকে জ্যাঠা ব'লে কেন মনে হয়েছিল, তার সঙ্গত কারণ অবশ্য একটা ছিল। চলচ্চিত্রে যেমন একটা ছবিকে অবলুপ্ত ক'রে মুহূর্তের মধ্যে আর একটা ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আমাকে দেখে তেমনই

তার নিষ্পলক চাহনিতে প্রথমে বিস্ময়, তারপর বিদ্রূপ ফুটে উঠেছিল। সেই নির্নিমেষ নীরব চাহনিকে ভাষায় অনুবাদ করলে অনেকটা এই রকম শোনাবে—'তুমিও এলে! অসুস্থ বাবাকে দেখতে এসেছ?'—একটু হাসি, তারপর—'তোমাদের সব্বাইকে ভাল ক'রে চিনি আমি'।

যথাসম্ভব আত্মসম্বরণসহকারে ঈষৎক্ষুন্ন আত্মসম্মানটাকে অনাবশ্যক রকম বর্মাবৃত ক'রে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বংশীকে বললাম, কই, স্বর্ণেন্দুর বাবা কোথায়? আমি তো কিছুই শুনি নি! এই অনুযোগটার মধ্যে যে কৃত্রিমতা ছিল, তা আমারও কানে বাজল। বংশী আলোটা এগিয়ে নিয়ে এল। দেখলাম স্বর্ণেন্দুর বাবাকে। মেঝেতে বিছানা পাতা, তারই ওপর শুয়ে রয়েছেন তিনি, গলা পর্যন্ত চাদর দিয়ে ঢাকা, মুখটুকু খোলা আছে শুধু। মুখের আধখানা মরা, আধখানা জীবন্ত! মরা অংশটা ভাবলেশহীন, চোখের পাতাটা যেন শ্রান্ত হয়ে ঝুলে পড়েছে, চোখেব কোলে জল, ঠোঁটের কোণটা নেমে এসেছে, সমস্তটা মিলে কেমন যেন একটা আত্মসমর্পণের ভাব। বৈজ্ঞানিকের সংজ্ঞা-অনুযায়ী যদিও তা মরা নয়, কিন্তু সাধারণের দৃষ্টিতে তা মৃত্যুর বাড়া; বেঁচে আছে, কিন্তু জীবনের বিকাশ নেই। জীবন্ত অংশটা কিন্তু অতিরিক্ত রকম জীবন্ত। চোখের দৃষ্টি প্রখর, অধর-প্রান্তে উদ্ধত অবজ্ঞা, রগের ওপর কুটিল গোটা-দুই শিরা স্পন্দিত হয়ে চলেছে ক্রমাগত।

অভ্যাসমত নাড়ীটা টিপে দেখলাম। ব্লাড-প্রেসার খুব

বেশি ব'লে মনে হ'ল না। হার্টের খবর নেবার জন্যে সংস্কার-অনুযায়ী স্টেথোস্‌কোপের অভাব অনুভব করলাম। রগের শিরা-গুলো দপদপ করছে কেন? বৈজ্ঞানিকভাবে ভাববার চেষ্টা করলাম একটু। রোগের ইতিহাস, রক্ত-পরীক্ষা—ডাক্তারী চিন্তা-পরম্পরাকে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে জীবন্ত চোখের দৃষ্টিটা যেন চীৎকার ক'রে উঠল, চোপ রও! জীবন্ত অধরপ্রান্ত উদ্ধত অবজ্ঞায় ব্যঙ্গ করতে লাগল। মরা চোখটা, দেখলাম, মিনতি করছে; অবনমিত মৃত অধর নীরবে বলছে, ক্ষমা করুন। অদ্ভুত ঐক্যতান!

ঠিক এর পর আমি কি করেছিলাম, কি বলেছিলাম, এর পরও কি ক'রে আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে ওয়েটিং-রুমের ঈজি-চেয়ারে ব'সে চায়ের পেয়ালা হাতে ক'রে তার সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা সম্ভবপর হয়েছিল, তা আমার মনে নেই। অস্পষ্টভাবে এইটুকু শুধু মনে আছে, ভদ্রতার হাসিটুকু মুখে ফুটিয়ে রেখে নমস্কার ক'রে আমি উঠে যাচ্ছিলাম—হ্যাঁ, সম্ভবত উঠে বাইরেই যাচ্ছিলাম, এমন সময় ঠিক যে কি কারণে আমি ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম—হয়তো অকারণেই, হয়তো কাপড়টা আটকে গিয়েছিল চেয়ারটার হাতলে, ঠিক মনে নেই এখন। কিন্তু ফিরে তাকালাম ব'লেই ব্যাপারটা ঘটতে পারল। ঠিক পর পর ঘটনাগুলো মনে নেই। যে ছবিটা এই সূত্রে মনের মধ্যে ফুটে উঠছে, সেটা এই—বংশী শশব্যস্ত হয়ে বার্নারটা ভাল ক'রে গরম হবার আগেই জোরে জোরে কয়েকবার পাম্প ক'রে স্টোভে তেল উঠিয়ে ফেলেছিল, জ্বলন্ত কেরোসিন তেলের হলদে আলোয় সহসা

তার চরিত্রের একটা দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আমার কাছে, অন্তত আমার তাই মনে হ'ল। তেল উঠিয়ে ফেলে বংশী শশব্যস্ত হয়ে উঠল, সে কিন্তু এতটুকু বিচলিত হ'ল না, কেবল ওষ্ঠের চাপে অধর যেন ঈষৎ কুঞ্চিত হ'ল, চোখের কোণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-করুণা-দীপ্ত এক ঝলক দৃষ্টি যেন মূর্ত হয়েই অবলুপ্ত হয়ে গেল, আর কিছু নয়। তারপর—ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই আমার—ছোট্ট দুটি কথা, সর তুমি। বংশী স'রে গেল, সে বসল গিয়ে স্টোভের কাছে। একটু পরেই স্টোভ-সাইলেন্সারের শতছিদ্রপথে মূর্ত হয়ে উঠল আগুনের নীল-কমল, রূপান্তরিত কেরোসিন-শিখা। আর বিশেষ কিছু মনে নেই।

এর পরেই যে ঘটনাটা মনে আছে, সেটা মর্মান্তিক ব'লেই মনে আছে, এবং সেটা ঘটেছিল দ্বিতীয় পেয়ালা চা খেতে খেতে। এতবড় মর্মান্তিক আঘাত এমন অপ্রত্যাশিতভাবে পাব—অর্থাৎ ঈশপের একচক্ষু হরিণের দুর্দশা যে আমার কপালেও লেখা ছিল, তা কল্পনা করি নি। চায়ের পেয়ালাটা ছোট ছিল, অল্পক্ষণেই শেষ হয়ে গেল।

আর একটু নেবেন ?

দিন।

প্রথম-পেয়ালা-পর্বের হালকা কথাবার্তায় আড়ষ্টতাটা ক'মে এসেছিল নিশ্চয়ই, যদিও প্রথম-পেয়ালা-পর্বের সে হালকা কথাবার্তাগুলো যে কি ছিল, তা মনে নেই। খুব সম্ভবত পক্ষাঘাত বিষয়েই দু-চারটে টুকরো আলোচনা, স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে দু-একটা

কথা, বংশী অবনীশের উল্লেখ ক'রে বংশী-সুলভ রসিকতার চেষ্টাও করেছিল যেন—অর্থাৎ সেই সব আলোচনা, যার কোন উদ্দেশ্য নেই, মাথা-মুণ্ড নেই, অর্থও সব সময়ে নেই, যার একমাত্র সার্থকতা অপরিচয়ের অথবা অতি-পরিচয়ের দুর্লঙ্ঘ্য আড়ষ্টতাকে সুলঙ্ঘ্য ক'রে তোলা।

দ্বিতীয় বার আমার পেয়ালাটায় চা ঢালতে ঢালতে, চায়ের পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই সে বললে, আপনি বিদেশী বই অনেক পড়েছেন, নয় ?

কিছু কিছু পড়েছি।

আপনার লেখা পড়লে সেটা বোঝা যায়।

এটা নিন্দা, না প্রশংসা, সেটা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্বেই চিনি মেশাতে মেশাতে এবং পেয়ালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেই মৃদুকণ্ঠে সে আবার বললে, একটা জিনিস বুঝতে পারি না আমি, স্বীকার করেন না কেন আপনারা ?

কি ?

ইব্‌সেনের পিয়ব গিনট থেকে আপনি আপনার নাটকে হুবহু খানিকটা নিয়েছেন, কীট্‌সের একটা বিখ্যাত কবিতার সঙ্গেও আপনার একটা কবিতার আশ্চর্য রকম মিল আছে, কিন্তু আপনি ঋণ স্বাকার করেন নি কোথাও। আজকালকার অনেক লেখকই করেন না; আমি ঠিক বুঝতে পারি না, এতবড় শক্তিশালী লেখকদের এ সামান্য দুর্বলতা কেন !

আমার মুখের পানে নির্নিমেষ নয়নে ক্ষণকাল চেয়ে রইল।

বংশী বোধ হয় বলতে যাচ্ছিল, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক ; কিন্তু 'গ্রেট মেন' পর্যন্ত ব'লেই সে হেসে ফেললে এবং চলকে-পড়া চায়ের প্রবাহে 'থিঙ্ক অ্যালাইক'টা ভেসে গেল।

গুলি খেয়ে একচক্ষু হরিণটা মারা গিয়েছিল।

আমারও মৃত্যু হ'ল।

নির্বাক হয়ে রইলাম আমি।

আপনার লেখা কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার।

মনে হ'ল, অনেক দূর থেকে ফোনে যেন সে কথা বলছে। ভাল লাগে! নিহত হরিণটার মাংসও নিশ্চয়ই ভাল লেগেছিল সেই শিকারীর।

হঠাৎ নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই চমকে উঠলাম।

শুনলাম, আমি বলছি, অনেক সময় অজ্ঞাতসারে, বুঝলেন কিনা, অনেক জিনিস—

ও, তাই নাকি?

ঠিক এর পরের মুহূর্তেই আমার সমস্ত সত্তা আমার দৃষ্টিপথ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে তার আনমিত মুখের দক্ষিণ অংশটুকুতে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল মখমল-কোমল কালো রঙের নিবিড় অন্ধকারে। কয়েকটি আবিষ্ট মুহূর্ত।

তারপর যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, একটা অজুহাত পেয়ে আমি চেয়ার ছেড়ে প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকে ছুটছি। প্ল্যাট্‌ফর্মে একটা সোরগোল উঠেছে, ট্রেন এসেছে একটা।

লোকে লোকারণ্য। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্‌',

'ইনকিলাব জিন্দাবাদ', 'বন্দে মাতরম্' চীৎকারের উপলক্ষ্য খদ্দর-পরিহিত মাল্যভূষিত ব্যক্তিটি ফার্স্ট ক্লাস থেকে নামলেন। মক্কেলহীন এই উকিলটি সকলেরই পরিচিত। ডেমোক্র্যাসি-যন্ত্রের নানা চাকায় নানা তৈল, যেখানে যেটির প্রয়োজন, নিপুণ-ভাবে নিষেক করতে পারলে ভাগ্যচক্র যে উন্নতিপথে ঘর্ঘরশব্দে ছুটে চলবার যোগ্যতা লাভ করে, ইনি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথম প্রথম ইনি দেশসেবার খুচরো কারবার করতেন, এখন পাইকারী ব্যবসা খুলেছেন—বচন, বুদ্ধি আর খদ্দর এই মূলধন নিয়ে। ভিড় চ'লে গেল, ট্রেন চ'লে গেল। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ও, তাই নাকি ?

কানের পাশে আবার গুঞ্জন ক'রে উঠল কথাগুলো। সহসা নিজেকে ওই মাল্যভূষিত চোরটার সগোত্র ব'লে মনে হ'ল। ব'সে পড়লাম। রঙিন শতরঞ্জিখানা প্রসারিতই ছিল, শিয়রে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বিছানা, পাশে নাম-লেখা কালো তোরঙ্গ। চোখ বুজে বিছানাটায় ঠেস দিলাম, ভারি নিঃস্ব মনে হতে লাগল নিজেকে। চুরি ধরা পড়েছে ক্ষতি নেই, কিন্তু ওর কাছে! তখন কে জানত যে, চোরাই-মাল-সমেত ওকেও ধরা পড়তে হবে একদিন আমার কাছে! কিন্তু না, জিনিসটা ঠিক তা নয়, ও ধরা পড়ে নি, ধরা দিয়েছিল। আকাশ-পাতাল তফাত যে! আমি হয়তো সারারাত তেমনই ভাবেই ব'সে থাকতাম, যদি না টেলিগ্রাফ-পিওনটা এসে বংশীর খোঁজ করত। বংশীর নামে একটা

টেলিগ্রাম এসেছিল। ওয়েটিং-রুমের দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে ডাকলাম বংশীকে। বংশী বেরিয়ে এসে টেলিগ্রাম খুলে দেখলে, তারপর ঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, জ্যোতির্ময়দা টেলিগ্রাম করেছেন—Missed train. Following in a taxi. Inform Ratri. Wait for me.

দরজার পাশে দেখলাম, রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে।

চুপ ক'রে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

৪

দিল্লী এক্সপ্রেসে যখন স্বর্ণেন্দু এল, তখন আমার একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। বংশীর ডাকে উঠে ব'সে সামনে দেখলাম, একমাথা রুক্ষ চুল, একমুখ রুক্ষ গোঁফ-দাড়ি, আড়ময়লা-জামা-কাপড়-ক্যাম্বিসের-জুতো-পরা এক ব্যক্তি আমার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। কক্‌খনও এ স্বর্ণেন্দু নয়। আমাদের সঙ্গে যে রোগা লাজুক ছেলেটি পড়ত, সে এই! আমি উঠে দাঁড়াতেই সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, ঘনশ্যাম, তুই! আর কিছু বলতে পারলে না সে।

স্বর্ণেন্দু ঘণ্টা দুই ছিল বোধ হয়। কিন্তু এই দু ঘণ্টার অধিকাংশ সময়ই সে আমার কাছে ছিল। এসেই মিনিট পাঁচেকের জন্যে একবার ওয়েটিং-রুমের ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর বরাবর আমার কাছেই ছিল। শুনলাম, মাকে আনতে সে মথুরা

গিয়েছিল, কিন্তু মা এলেন না। সংসারের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে আর আসতেই চান না নাকি তিনি। একটু ম্লান হেসে স্বর্ণেন্দু বললে, মায়ের মাঝে মাঝে ওই রকম ধর্মবাই চাগে, সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে স'রে পড়েন তিনি, আবার কিছুকাল পরে ফিরে আসেন, আবার চ'লে যান। বাবার পক্ষাঘাত হয়ে আরও সুবিধে হয়েছে তাঁর। আসল কথা কি জানিস? ওয়েটিং-রুমের দিকে চেয়ে নিম্নকণ্ঠে বললে, রাতুই আসল কারণ। ওর বিয়ে নিয়েই ভাই যত গোলমাল। মা একটু—মানে, আজকালকার স্বাধীন মত-টতগুলো পছন্দ করেন না। তাই বা বলি কি ক'রে। একটু থেমে, ছোট্ট একটু হেসে বললে, মানে, আমাদের সঙ্গে তর্কে না পেরে রাগারাগি ক'রে শেষকালে পালিয়ে যান।

কোথা যান?

কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ, যখন যেখানে তাঁর গুরুদেব থাকেন। তাঁকে খবর দিলেই গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন।

একটু খটকা লাগল।

গুরুদেব গাড়িভাড়া পাঠিয়ে দেন?

হ্যাঁ। মাকে তুই দেখিস নি কখনও, অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ মা। মাঝে মাঝে দেবতার ভর হয় তাঁর ওপর।

দেবতার ভর হয়?

না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ভারি অদ্ভুত কিন্তু।

মায়ের গল্প শেষ ক'রে স্বর্ণেন্দু নিজের বেকার জীবনের ইতিহাস শুরু করলে। কত রকম ভাবে চেষ্টা ক'রে সে কত

রকম ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, তারই বর্ণনা। দু ঘণ্টা ধ'রে নানা ছন্দে একই কাহিনী শুনলাম। তার সব কথা মনে নেই ; কিন্তু এটা বেশ মনে আছে, স্বর্ণেন্দুকে সেদিন যেন নূতন রূপে দেখলাম। লাজুক রোগা যে স্বর্ণেন্দু আমাদের সঙ্গে পড়ত, এ যেন সে নয়, এ যেন তার থেকেই উদ্ভূত অন্য আর একজন।

প্রায় বছর দশেক আগে একবার মামার বাড়ি গিয়েছিলাম। তখন মামার বাড়ির চেহারা ছিল—তকতকে ঝকঝকে উঠোন, উঠোনের এক কোণে বাঁশের মাচায় কচি শসা ঝুলছে, দক্ষিণ দিকে মাটির দেওয়াল বেয়ে ঝিঙেলতা উঠেছে—তাতে অজস্র ঝিঙেফুল, দাঁড়ে টিয়াপাখি চোখ পাকিয়ে হরিনাম শোনাচ্ছে সবাইকে, রান্নাঘরের দাওয়ায় মামীমা তাঁর নিজস্ব ছোট উনুনটার ধারে ব'সে কখনও পাটিসাপটা, কখনও সন্দেশ, কখনও ক্ষীরপুলি তৈরি করছেন। মামারা এখন শহরে, বাড়িতে কেউ নেই। মাস-দুয়েক আগে একটা কার্যোপলক্ষ্যে আবার সেখানে গিয়েছিলাম আমি। বাড়িটার আর এক রকম চেহারা দেখে এলাম। উঠোনে একহাঁটু জঙ্গল—কচু, ঘেঁটু, মনসা, আপাং, শেয়ালকাঁটা, আরও কত রকম গাছ গজিয়ে ছেয়ে ফেলেছে উঠোনটাকে। গিরগিটি, ছাতারে পাখি নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শ্রী যে নেই তা নয়, কিন্তু নতুন রকম শ্রী।

স্বর্ণেন্দুকে দেখে মামার বাড়ির ছবি দুটো পর পর চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল সেদিন। আগে যে কথাই বলত না, সে বাক্যবাগীশ হয়ে উঠেছে। ক্রমাগত ব'কে চলেছে।—

বুঝলি ভাই, দরখাস্ত নিয়ে তো গেলাম লোকটার কাছে, সে আমাকে মুখে একেবারে স্বগ্‌গে তুলে দিলে, বুঝলি ভাই, বললে, ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. যখন তুমি, তখন তোমার আর ভাবনা কি, নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, আমি প্রাণপণে রেকমেণ্ড করব তোমাকে। ও হরি, শেষকালে শুনলাম, সবাইকেই ওই কথা বলেছে লোকটা, আসলে ঘুষ না দিলে কিছু করবে না।

এমন অদ্ভুত একটা ছোট্ট হাসি হেসে স্বর্ণেন্দু আমার মুখের পানে চাইলে, যার অর্থ—সত্যি সত্যি ঘুষ দিয়ে তো আর চাকরি নেওয়া যায় না, সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল।

ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং ঘড়াং—

যে এঞ্জিনটা এতক্ষণ সোঁ-সোঁ করছিল, সেটা মাল-গাড়ি শাণ্ট করছে। খানিকক্ষণ বোধ হয় ট্রেন আসার সম্ভাবনা নেই, আপ-ডাউন-ভাষী বাবুটি কার্বন-পেপারের ওপর পেন্সিল পিষে চলেছেন। কুলীগুলো সার সার শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তারপর বুঝলি, চাকরির চেষ্টা ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে একটা দোকান করলাম। প্রথম প্রথম বেশ চলল কিছুদিন, বাঙালীরা সব্বাই আমার দোকান থেকে জিনিসপত্তর কিনতে লাগল, কিন্তু ক্যাপিটাল বেশি ছিল না, শেষ পর্যন্ত চালাতে পারলাম না, ভয়ানক কম্‌পিটিশন ভাই, বুঝলি ?

আবার সেই ছোট্ট ধরনের হাসি হেসে ভয়ানক কম্‌পিটিশনের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে সে নিরস্ত হচ্ছিল। আমি বললাম,

বাঙালীরা সবাই কিনতে লাগল, অথচ দোকান চলল না, তার মানে ?

স্বর্ণেন্দু একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল, অর্থাৎ আসল কথাটা ব্যক্ত করতে তার নিজেরই যেন মাথা কাটা যাচ্ছিল। তার গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ ক'রে সাবেক কালের লাজুক স্বর্ণেন্দু যেন ক্ষণিকের জন্যে আত্মপ্রকাশ করলে।

মানে, বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো, সবাই প্রায় ধারে কিনত, সব সময়ে সকলে ক্রেডিট-মেমোতে সইও করত না, আর ক্রেডিট-মেমোতে সই করলেও কি আর আমি নালিশ করতে পারতাম ? অনেকে বাবার বন্ধু, অনেকে আমার বন্ধু, সবই প্রায় আপনা-আপনি, কিনতে এলে চক্ষুলজ্জার জন্যে 'না' বলতে পারতাম না, মানে, আমাদের বাঙালীদের অবস্থা বুঝিস তো ? একটু হেসে সে এমন ভাবে কুণ্ঠিত দৃষ্টি তুলে চাইলে, যেন সে সমস্ত বাঙালী জাতির হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছে।

আমি ওর কথা শুনছিলাম না যে তা নয়, কিন্তু শোনার চেয়ে বেশি দেখছিলাম আমি ওকে। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওর ছোট ছোট হাসির টুকরো, ওর রুক্ষ চুল দাড়ি গোঁফ, ওর আদর্শবাদ, ওর সত্যনিষ্ঠা, ওর অসহায় ভঙ্গী—সবটা মিশিয়ে নতুন ধরনের স্বর্ণেন্দু। এখন বুঝতে পারছি, বেকার-জীবনের শত লাঞ্ছনার মধ্যেও ও হাসিমুখে টিকেছিল সত্যনিষ্ঠার জোরে। সম্ভবত একবার মাত্র মিথ্যে কথা ও জীবনে বলেছিল এবং বলবার পর আর বেঁচে থাকে নি।

ইন্সিওরেন্সের দালাল হয়ে কিছুদিন ঘুরলাম, কিন্তু ও আমার পোষাল না ভাই, বড্ড বেশি মিথ্যে কথা বলতে হয়, তা ছাড়া খোশামোদও করতে হয় ভয়ানক—কম্পানির খোশামোদ কর, পাব্লিকের খোশামোদ কর, ডাক্তারের খোশামোদ কর,—দেশের অধিকাংশ লোকই রুগ্ন, তাদের সুস্থ ব'লে চালাতে হবে তো! তুই তো নিজে ডাক্তার, তোকে নিশ্চয়ই বিপদে পড়তে হয় এই নিয়ে মাঝে মাঝে, বুঝতেই পারছিস।

আবার সেই অদ্ভুত রকম ছোট্ট হাসি হেসে, যার অর্থ—মিথ্যে কথা ব'লে ব'লে তো আর টাকা রোজগার করা যায় না, সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল। স্বর্ণেন্দু চুপ করলে।

একটার পর একটা—অনেক কাহিনী শুনলাম, প্রত্যেক কাহিনীর শেষেই 'সুতরাং স'রে পড়তে হ'ল'-ব্যঞ্জক হাসি।

তোদের চলছে কি ক'রে তা হ'লে?

অভদ্র এই প্রশ্নটা আমার জিভ থেকে ছটকে বেরিয়ে পড়ল।

বাবার পেন্‌শন। বাবার মৃত্যু হ'লেই আমাদের মৃত্যু। বাবাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছি তাই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে। কলকাতায় অবশ্য ছোটখাট বাড়ি আছে আমাদের একটা, কিন্তু সেটা এমন জায়গায় যে, তার ভাড়াটেই জোটে না।

আবার হাসলে স্বর্ণেন্দু এবং আমার মনে যে অভদ্রতর প্রশ্নটা উঁকি দিচ্ছিল, অজ্ঞাতসারেই তার জবাবও দিয়ে দিলে।

ভাগ্যে অবনীশ কিছু টাকা দিয়েছে, আর জ্যোতির্ময়ের

একটা বাড়ি আছে মধুপুরে, তাই বাবাকে নিয়ে চেঞ্জে যেতে পারছি, তা না হ'লে বাবার পেন্‌শনে এত সব কুলোয় কি?

অবনীশই বা কে, জ্যোতির্ময়ই বা কে?

ছুজনেই আমার বন্ধু। অবনীশ বোম্বেতে বিজ্‌নেস করে, বেশ ছু-পয়সা করেছে। জ্যোতির্ময় একজন আর্টিস্ট।

ও।

বংশী চা দিয়ে গেল। বংশী ঠিক চাকরের মত খাটছে দেখলাম। বংশী চ'লে যেতে স্বর্ণেন্দুকে জিজ্ঞেস করলাম, বংশী তোদের সঙ্গেই থাকে বুঝি বরাবর?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকে। ওর বাপ-মা কেউ নেই, আমার বাবাই মানুষ করেছেন, ওকে বি. এ. পাস করাবার জন্যে কি কম চেষ্টা করেছেন বাবা, কিন্তু কিছুতেই ও পাস করতে পারলে না।

বংশীর সম্বন্ধে এই অপ্রীতিকর উক্তিটা ক'রে স্বর্ণেন্দুর মনে বোধ হয় ঈষৎ ক্ষোভ হ'ল, একটু হেসে বললে, এক-একজনের পরীক্ষা পাস করবার 'ন্যাক' থাকে না, বংশী এদিকে বেশ ইয়ে আছে।

নীরবেই ছুজনে চা-পান শেষ করলাম।

স্বর্ণেন্দু নিজের প্রসঙ্গ শেষ ক'রে আমাকে নিয়ে পড়ল।

তুই কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস করিস কোন্‌খানটায়?

বেনেটোলায়।

বেনেটোলার ধরণীবাবুকে চিনিস? বেনেটোলায় আমার দূর-সম্পর্কের একজন ভগ্নীপতিও থাকেন— নিখিল চৌধুরী, উকিল।

কাউকেই চিনি না আমি।

এবার গিয়ে আলাপ করিস।

ঠিকানা দিয়ে দিলে স্বর্ণেন্দু।

বেনেটোলায় কি ওঁদের নিজেদের বাড়ি ?

ধরণীবাবুর নিজের বাড়ি, নিখিলদা ভাড়াটে বাড়িতে থাকেন, অনেকদিন ধ'রে আছেন ওই বাড়িতে। বেশ লোক।

আচ্ছা, এবার গিয়ে আলাপ করা যাবে।

নম্বর দুটো টুকে নিলাম।

চমৎকার লিখছিস আজকাল ভাই তুই কিন্তু। রাতু তো তোর লেখার ভয়ানক 'অ্যাড্‌মায়ারার'।

লক্ষ্য করলাম, 'ভয়ানক' কথাটা ভয়ানকভাবে ব্যবহার করে স্বর্ণেন্দু। রাতু আমার লেখার ভয়ানক অ্যাড্‌মায়ারার শুনেই বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিকভাবে ব'লে ফেললাম, ওর বিয়ের একটা কিছু ঠিক ক'রে ফেল্‌ এবার। আমিও চেষ্টায় থাকব। মেয়ের বিয়ে আজকাল একটা সমস্যা।

রাতুর বেলায় সমস্যা হ'ত না, মা যদি না অবুঝ হতেন। মায়ের মাথায় যে কি ঢুকেছে, তা বলতে পারি না। জ্যোতির্ময়, মানে, আমার আর্টিস্ট বন্ধুটি, ওকে এখুনি বিয়ে করতে রাজি, কিন্তু মা কিছুতেই মত দিচ্ছেন না, আর মায়ের মত না পেলে জ্যোতির্ময় বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। মায়ের পছন্দ অবনীশকে।

কেন ?

অবনীশ দু-পয়সা রোজগারও করে, তা ছাড়া একটু ধার্মিক-গোছের—মায়ের আরও পছন্দ সেইজন্যেই বোধ হয়।

অবনীশ রাজি নয় বুঝি ?

অবনীশ রাজি আছে, আমরা, মানে, আমি মত দিই নি।

কেন ?

ঝাঁকড়া গোঁফ-দাড়ি সত্ত্বেও লাজুক স্বর্ণেন্দু পুনরায় আত্ম-প্রকাশ করলে, তারপর তৎক্ষণাৎ ছোট্ট একটু হেসে সামলে নিলে লজ্জাটা। তারপর উকিলরা যেমন আসামীর পক্ষ নিয়ে বলে, তেমনই ভাবে বলতে লাগল, রাত্নু বেচারা মেয়েছেলে হয়ে জন্মেছে ব'লে কি তার নিজের পছন্দ অপছন্দ থাকতে নেই ? নিজে সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না ব'লে সব জেনে-শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না ? আমি জানি—

এইটেই স্বর্ণেন্দুর লজ্জার কারণ সম্ভবত, কিন্তু সেটা খুলে বললে না সেদিন। একটু থেমে শুধু বললে, অবনীশটা নিরামিষ খেয়ে, সন্ধ্যাহ্নিক ক'রে আর বার বার টাকা পাঠিয়ে মাকে হাত করেছে, মা এক রকম কথাই দিয়েছেন তাকে। অথচ আসল কথাটা জেনে কি ক'রে আমি—

মুচকি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

একটু পরে আর একটু মুচকি হেসে বললে, এই যে রাত-দুপুরে জ্যোতির্ময় ট্যাক্সি হাঁকিয়ে ছুটে আসছে—

কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই থেমে গেল স্বর্ণেন্দু, হঠাৎ খুব যেন

গম্ভীর হয়ে পড়ল, হঠাৎ যেন লাজুক স্বর্ণেন্দুকে আড়াল ক'রে আদর্শবাদী ভাবুক স্বর্ণেন্দু ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নালের লাল আলোটার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ, তারপর হঠাৎ সেই অদ্ভুত ছোট্ট হাসিটা হেসে কি একটা বলতে গিয়ে আবার থেমে গেল, থেমে গিয়ে অপ্রতিভ হ'ল একটু।

তোর মা জ্যোতির্ময়ের ওপর চটা কেন?

ঠিক উলটো। ভয়ানক ভালবাসে মা ওকে, অবনীশের চেয়ে বেশি ভালবাসে, কিন্তু ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি নয় কিছুতেই।

কেন, গরিব ব'লে?

জ্যোতির্ময় খুব গরিব নয়, মধুপুরে বাড়ি আছে, কলকাতায় বাড়ি আছে, ছবি এঁকে রোজগারও করে কিছু; কিন্তু হ'লে কি হবে, ভয়ানক উড়ন্‌চণ্ডে, বেপরোয়া, খামখেয়ালী।

তোর সঙ্গে আলাপ হ'ল কি ক'রে?

মা-ই ওকে আবিষ্কার করেন প্রথমে কাশীতে। মায়ের মুখ থেকেই শুনেছি, ওর বাবা নাকি মায়ের গুরুদেবের শিষ্য ছিলেন। জ্যোতির্ময় হবার পর ওর মা মারা যান, কিছুদিন পরে বাবাও। মায়ের গুরুদেবই জ্যোতির্ময়কে মানুষ করেছেন। জ্যোতির্ময়ের যে সম্পত্তি গুরুদেবের কাছে গচ্ছিত ছিল, সেসব জ্যোতির্ময় বড় হবার পর জ্যোতির্ময়কে দিয়েছেন তিনি।

ঢনঢং ঢনঢং ঢনঢং—

আমার ট্রেন এসে পড়ল, কুলীটা এসে দাঁড়াল, তাড়াতাড়ি

শতরঞ্চি গুটিয়ে উঠে পড়লাম। 'চিঠি দিস মাঝে মাঝে'—কলরবের মাঝে স্বর্ণেন্দুর কথাগুলো এখনও শুনতে পাচ্ছি যেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, ওয়েটিং-রুমের দরজায় নীরবে রাত্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ পাখাটা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য গরম। একটা দমকা হাওয়ায় তপ্ত ধূলোগুলো ঘুরপাক খেয়ে উড়ছে। বুড়ো মুচী আর কইলু ইতর ভাষায় কলহ শুরু ক'রে দিয়েছে। লোম-ওঠা কুকুরটা ধুঁকছে রাস্তার এক ধারে ব'সে। একটা টমটমের সঙ্গে একটা সাইকেলের ধাক্কা লেগে গেল। ছিটকে পড়ল সাইকেলের ছোকরা, তারই দোষ, সে দু হাত ছেড়ে দিয়ে বাহাদুরি করতে করতে যাচ্ছিল। টমটমওয়ালা ছুট দিলে ঊর্ধ্বশ্বাসে। তাকেই দোষী সাব্যস্ত ক'রে কতকগুলো লোক ছুটল তাকে ধরতে। ঝগড়া ভুলে বুড়ো মুচী আর কইলুও ছুটল। কি অদ্ভুত আবেষ্টনী! আজ আর লিখব না। সুর কেটে গেছে। আব একদিন শুরু করা যাবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কিছুক্ষণ আগে এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

পৃথিবী সামান্য একটু ঠাণ্ডা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ হয় নি। ছানা কেটে গেলে দুধ যেমন দেখতে হয়, খোবা খোবা

ছানার ফাঁকে ফাঁকে সবুজাভ ছানার জল যেমন দেখা যায়, এক পসলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আকাশের অবস্থা অনেকটা তেমনই হয়েছে। ফাটা মেঘের মাঝে মাঝে পরিষ্কার আকাশ দেখা যাচ্ছে। মেদুর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক আবিষ্ট। মেঘমুক্ত পূর্ণিমা-রাত্রির শোভা নয়, আবছা অর্ধস্ফুট মাধুরী। দেওয়ালের ও-পাশে সদ্যস্নাত হাস্নুহানার ঝাড়ে উৎসব শুরু হয়ে গেছে, টের পাচ্ছি। খোলা আকাশের নীচে ব'সে আছি, কিন্তু মশারির ভেতর। ভয়ানক মশা। এমন রাত্রে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ভাল লাগে। পাশে কোন সঙ্গিনী থাকে তো ভালই, না থাকলেও ক্ষতি নেই। বস্তুত সশরীরে না থাকাটাই বোধ হয় বেশি বাঞ্ছনীয়, অনায়াসে কল্পনা ক'রে নেওয়া যেতে পারে, নীলাম্বরী তন্বী একজন ব'সে আছে পাশে। সেই কল্পনা-সঙ্গিনী আর যা-ই করুক, কথা ব'লে রসভঙ্গ করবে না।

কিন্তু এসব কিছু না ক'রে লণ্ঠন জ্বেলে আমি লিখতে বসলাম। স্বর্ণেন্দু এসে ভর করেছে। এই মেঘমেদুর জ্যোৎস্নার মধ্যে স্বর্ণেন্দু প্রচ্ছন্ন হয়ে এসেছে কি না, কে জানে!

কলুটোলার মোড়ে তার সঙ্গে হঠাৎ দেখাটার কথা মনে পড়ছে।

মশারির বাইরে রক্তপিপাসু অসংখ্য মশা চীৎকার ক'রে তাই করছে, প্রচলিত ভাষায় যাকে গুঞ্জন বলে। এই রক্তলোভী মশার দল কোন মন্ত্রবলে হঠাৎ যদি মালপো-লোভী বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীতে রূপান্তরিত হয়ে সবিনয়ে আমাকে বলে, আপনাকে

একটা কীর্তন শোনাতে এসেছি আমরা, দয়া ক'রে মশারিটি তুলে বসুন, তা হ'লে আমি যত আশ্চর্য হয়ে যাই, তার চেয়েও বেশি আশ্চর্য হয়েছিলাম সেদিন স্বর্ণেন্দুর হাতে টকটকে লাল খাপে ঢাকা চকচকে ছোরাখানা দেখে। অথচ ভেবে দেখলে ব্যাপারটা এমন কিছু চমকপ্রদ নয়। মানুষের হাতেই তো ছোরা থাকে। আসলে সেদিন শেষরাত্রে প্ল্যাট্‌ফর্মের ওপর ব'সে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে যে ধারণা করেছিলাম, তার মধ্যে ছোরার সম্ভাবনা ছিল না। রজ্জু সহসা সর্পে রূপান্তরিত হ'লেই আমরা চমকাই। একটু পরেই অবশ্য বুঝতে পেরেছিলাম যে, রজ্জুতে আমার সর্পভ্রম হয়েছে, রজ্জু ঠিক রজ্জুই আছে। কিন্তু ওই ভ্রমের মধ্যেও যে একটা নিষ্ঠুর ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল, সেদিন তা বুঝি নি।

ধরণীবাবুর কথাগুলো মনে পড়ছে—ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশাই, ওরা বাঙালী নয়, আলাদা জাতের লোক। ধরণীবাবু লোকটি অবশ্য নিখাদ বাঙালী। চাকরি ক'রে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন, পরনিন্দা করেন, দোল-দুর্গোৎসব করেন, বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্রে 'লৌকিকতা গ্রহণে অসমর্থ' ছাপান, লৌকিকতা গ্রহণ করেন তা সত্ত্বেও, দেনও ; বাড়িতে শাক-চচ্চড়ি খেয়ে বাইরে সশব্দে উদ্গার তুলে মুখবিকৃতি ক'রে বলেন, রিচ ফুড আর হজম হয় না মশাই ; ভুঁড়ি আছে, টাক আছে, অষ্টধাতুর আংটি আছে, হুঁকো আছে। বাড়িতে ন-হাতী কাপড় প'রে মিতব্যয়িতা এবং সকালবেলা টুকটুক ক'রে হেঁটে স্বাস্থ্য-চর্চা করেন। আলাপ হবার পর থেকে এই প্রাতর্ভ্রমণের মুখে

মাঝে মাঝে তিনি আমার বাসায় এসে চা-পান করতেন, এবং সেই সময়ই স্বর্ণেন্দুদের সম্বন্ধে আলোচনা চলত। স্বর্ণেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দুবাবুর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল সেই কারণে, যে কারণে নাকি, তাঁর ভাষায়, 'দুটো কুকুরের মধ্যেও বন্ধুত্ব হওয়া সম্ভব'—অর্থাৎ দায়ে প'ড়ে। চাকরির ঘূর্ণাবর্তের টানে দুজনেই এমন স্থানে গিয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তৃতীয় কোন বাঙালী ছিল না। সুতরাং বন্ধুত্ব হয়েছিল, ধরণীবাবু এটাকে বন্ধুত্বই বলতেন, যদিও তাঁর কথাবার্তা থেকে বেশ বোঝা যেত যে, এ বন্ধুত্বের মধ্যে যে বন্ধন ছিল, তা আত্মার নয়, স্বার্থের। ধরণীবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর পাল্লায় প'ড়েই নাকি তামাক খেতে শিখেছিলেন, অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি, কারণ পূর্ণেন্দুবাবু বন্ধু হ'লেও তাঁর ওপরওলা অফিসার ছিলেন।

বাঙালী ব'লেই যেতে হ'ত—ধরণীবাবু বলতেন,—সায়েবী ধাতেরই হোক আর যা-ই হোক, বাঙালী তো, নাড়ীর যোগ আছে একটা। নাড়ীর টানে যেতাম, কিন্তু আলাপ জমত না। পূর্ণেন্দুবাবু ঢিলে পা-জামা প'রে আর পাইপ কামড়ে যেসব গল্প জুড়তেন, তা এমন বিদঘুটে যে, তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। এই ধর না, একদিন সাফ্রাজেট্‌সদের নিয়েই খুব বক্তৃতা শুরু করলেন, কি করব, সায় দিয়ে যেতাম। একদিন বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ থেমে গিয়ে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার মুখের পানে। তারপর বললেন, তামাক ধর তুমি।

ধরণীবাবুর কথায় আমিও মুচকি হেসে সায় দিতাম। আমি

ডাক্তার, ব্যবসার খাতিরেই আমাকে মুচকি হেসে সায় দেওয়াটা শিখতে হয়েছিল। মুচকি হাসির সায় পেয়ে ধরণীবাবুর মনের দরজাটা আরও খুলে যেত, অনর্গল ব'লে যেতেন তিনি এদের কথা। তবে সমস্ত কথা যে তিনি বলেন নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম কিছুদিন পরে।

কলুটোলা স্ট্রীট যেখানে এসে কলেজ স্ট্রীটে মিশেছে, সেইখানেই হঠাৎ স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে আবার দেখা। মনে পড়ছে, ঠিক সেই সময় মেডিকেল কলেজের গেট থেকে একটা মড়াকে কাঁধে নিয়ে হরিধ্বনি করতে করতে জন-কয়েক লোক কলুটোলার মোড়ের দিকে এগিয়ে আসছিল, ঠিক ওই মোড়ের কাছাকাছি আপাদমস্তক পেতলের বালা-পরা যে উড়েনীটা ফুটপাথে শুয়ে থাকত, তার কাছে মোটা-গোছের একজন বাবু উবু হয়ে ব'সে কিছু খাবার নিয়ে তাকে খাওয়াবার জন্যে সাধ্যসাধনা করছিলেন, (উড়েনীর সম্বন্ধে নানা রকম গুজব প্রচলিত ছিল—কেউ বলত, ও নাকি তন্ত্রসিদ্ধ যোগিনী ; কেউ বলত, স্পাই ; কেউ বলত, পাগল।) হার্ডিঞ্জ হস্টেলের ওপরতলা থেকে কে যেন গাইছিল —'কে যাবি পারে', আমি এস্প্ল্যানেডের ট্রাম থেকে নেবে হার্ডিঞ্জ হস্টেলের দিকেই যাচ্ছিলাম আমার মামাতো ভাই হারাধনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ; তখনও ঠিক সন্ধ্যে হয় নি, এজরা হস্পিটালের পেছন দিকের গাছগুলোতে অসংখ্য কাকের ডাকাডাকি শুনে সেদিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়ল, স্বর্ণেন্দু চলেছে ওপারের ফুটপাথ দিয়ে। মাথা হেঁট ক'রে কি যেন

ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমন ভাবে চলেছে—যেন তার আশপাশে আর কেউ নেই, যেন সে আর তার সমস্যা ছাড়া অন্য সব কিছু অনাবশ্যক, এত অনাবশ্যক যে—তাদের দিকে ফিরে চেয়ে তাদের অস্তিত্বটুকু স্বীকার করবার মতও বাড়তি সময় যেন নেই তার।

স্বর্ণেন্দু!

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল, আমাকে দেখতে পেল না, সবিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কলুটোলার ফুটপাথে কাক-কলরব-মুখরিত আসন্ন সন্ধ্যায় তার চোখের বিস্মিত সেই দৃষ্টি এখনও আমি যেন দেখতে পাচ্ছি।

এগিয়ে গেলাম।

ও, তুই ঘনশ্যাম!

একটু ছোট্ট হাসি, তারপর কলুটোলার ফুটপাথে তার আকস্মিক আবির্ভাবের জন্য সলজ্জ একটু জবাবদিহি—একটা চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম ভাই, সিটি কলেজে একটা লেক্‌চারারের পোস্ট খালি ছিল—। একটু থেমে—হ'ল না, লোক ঠিক হয়ে গেছে। তারপর এমন হাসি-ভরা চোখে সে চেয়ে রইল, যেন স্বর্ণেন্দু নামক বেকার যুবকের চাকরির জন্যে এই হাস্যকর ছটফটানিটা সে নিজে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উপভোগ করছে।

তোর হাতে ওটা কি?

খবরের কাগজের মোড়কটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল লাল খাপে ঢাকা বাঁকা ছোরাটা।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমি।

কিনলি নাকি ?

না। এটা ফার্নান্‌ডিজ রাতুকে জন্মদিনে উপহার পাঠিয়েছে। আমাদের এখানকার ঠিকানায় প'ড়ে ছিল, নিয়ে যাচ্ছি।

ফার্নান্‌ডিজ কে আবার ?

বাবা যখন ব্যাঙ্গালোরে ছিলেন, ফার্নান্‌ডিজ তখন আমাদের ড্রাইভার ছিল। প্রতি বছর রাতুর জন্যে একটা না একটা কিছু পাঠায়।

স্বর্ণেন্দুর চোখ দুটো সহসা যেন স্বপ্নাতুর হয়ে এল। বলতে লাগল, তখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তবু তার চেহারাটা একটু একটু মনে আছে এখনও। লম্বা-চওড়া কালো-কুচকুচে চেহারা। একটু থেমে—হাবসী ক্রিশ্চান। খুব ভালবাসে রাতুকে, ও বাহাল হবার বছর দেড়েক পরে রাতুর জন্ম হয়, মানে রাতুকে জন্মাতে দেখেছে ব'লেই বোধ হয়—। ছোট্ট হাসিটি হেসে চুপ করলে স্বর্ণেন্দু।

খুলে দেখলাম। খাপ থেকে খুলতেই চকমক ক'রে উঠল। স্বর্ণেন্দুর মুখখানা ছোরাটার শাণিত ফলকে বিকৃতভাবে প্রতি-ফলিত হয়ে উঠল একবার। মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে স্বর্ণেন্দু বললে,- ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই, চললাম ভাই।

মধুপুরেই ফিরে যাচ্ছিস ?

হ্যাঁ।

জ্যোতির্ময়বাবু এসেছেন ?

সেই দিনই তো ট্যাক্সি ক'রে এসে পড়ল, তুই চ'লে যাবার একটু পরেই।

বাবা কেমন আছেন ?

তেমনিই।

ঘাড় নেড়ে হেসে স্বর্ণেন্দু চ'লে গেল।

২

তাড়াতাড়িতে স্বর্ণেন্দুকে তখন বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, তার দূর-সম্পর্কের ভগ্নীপতি নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে শুধু আলাপ নয়, বেশ একটু মাখামাখি হয়েছে আমার। মাখামাখি হবার একটা স্থূল আধিভৌতিক কারণও ঘটেছিল। বিপত্নীক নিখিল চৌধুরীর কম্বাইণ্ড হ্যাণ্ড কাহার চাকর চামেলির রন্ধনপটুতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমার গোকুলচন্দ্র যে মাংস রাঁধতে পারে না তা নয়, কিন্তু খুব ভাল করবার আগ্রহাতিশয্যে ধনে-হলুদ-আদা-জিরে-দই-পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কার সম্মিলনে যে বস্তু সে প্রস্তুত করে, তা শুধু যকৃতের নয়, রসিকের পক্ষেও দুষ্পাচ্য। ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণ ওই চামেলির রান্নার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তা মসলার নয়, ওর নিজের বৈশিষ্ট্য। সুস্বাদটারই প্রাধান্য, উপকরণের নয়। একটা কথা ভেবে ভারি আশ্চর্য লাগে, এই চামেলি না থাকলে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার মৌখিক আলাপটা হৃদ্যতায় পরিণত হ'ত না এবং এই উপাখ্যানের অনেকখানিই হয়তো আমার অগোচরে থেকে যেত।

সেদিন সকালে গোটা-চারেক বুনো হাঁস কিনেছিলাম। হৃষ্টপুষ্ট গোটা-চারেক 'লালসর'। খাবার জন্যেই যখন কিনে-ছিলাম, তখন তাদের মৃত্যু অনিবার্য; সহসা মনে হ'ল, গোকুল রান্না করলে এ মৃত্যু শোচনীয়ও হয়ে উঠবে। দিলাম পাঠিয়ে সেগুলো নিখিল চৌধুরীকে। সদ্গতি হবে।

হার্ডিঞ্জ হস্টেলে হারাধনের সঙ্গে দেখা সেরে ফিরে এসেই নিখিলবাবুর চিঠি পেলাম—

ঘনশ্যামবাবু,

লালসর শুধু বন্য হংস নহে, পরম হংস। এই কলিকাতা শহরে মহাভাগ্যবলে দৈবাৎ ইহাদের দর্শনলাভ ঘটে। আপনার উদারতার জন্য গদ্গদকণ্ঠে সাধুবাদ জানাইয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি শীঘ্র আসুন, চামেলি তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

নিখিল চৌধুরী

না উড়লে নীলকণ্ঠ পাখির নীল-বর্ণসম্পদ যেমন সম্যকরূপে নয়নগোচর হয় না, একটু উত্তেজিত না হ'লে তেমনই আসল নিখিল চৌধুরীকে চেনা যায় না। সেদিন সন্ধ্যায় আহারাদির পূর্বেই খোলা ছাদে ক্যাম্প-চেয়ারে ঠেস দিয়ে স্বর্ণেন্দুর কথা আলোচনা করতে করতে নিখিল চৌধুরী একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এক নজর আমার পানে চেয়ে হাতীর দাঁতের নস্য-দানিটা থেকে বড় এক টিপ র-ম্যাড্রাসী নস্যি বার ক'রে একটু হেঁট হয়ে ঘন ঘন নাকের ছিদ্র দুটো বোঝাই ক'রে নিলেন।

তারপর নাকের আশপাশে-লাগা নস্যিটা না ঝেড়েই ঈষৎ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, কিছুই জানেন না আপনি।

বুঝলাম, নিখিল উত্তেজিত হয়েছেন। কারণ, আমি যে কিছু জানি—এ দাবি আমি মোটেই করি নি। স্বর্ণেন্দুকে উপলক্ষ্য ক'রে যে কথোপকথন শুরু হয়েছিল, তা স্বর্ণেন্দুতেই নিবদ্ধ ছিল না, রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে আবর্তিত হচ্ছিল এবং সেই আবর্তের মুখে আমি কেবল আমার সরল বিশ্বাসটুকুই ব্যক্ত করেছিলাম, কালো হ'লে কি হয়, চমৎকার দেখতে মেয়েটি! এ কথা শুনে প্রথমটা কিছু বলেন নি নিখিলবাবু, কিন্তু দ্বিতীয় বার এ কথা বলতেই নস্যি নিয়ে উক্ত উক্তিটি করলেন।

আমি পুনরায় বললাম, চমৎকার নয়?

আবার এক টিপ নস্যি তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে কটমট ক'রে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার পানে, তারপর সশব্দে সেটা নাসারন্ধ্রে টেনে নিয়ে নাকের আশপাশের নস্যি-গুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মনে হ'ল যেন অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর! তারপব আমি কিছু বলবার আগেই স্ফুটকণ্ঠে ব'লে উঠলেন, চেকভ না শেহভ, উচ্চারণ ঠিক জানি না, তাঁর লেখা 'ডার্লিং' আপনি পড়েছেন?

পড়েছি।

আনাতোল ফ্রাঁসের 'থেয়া' না 'থেস', উচ্চারণ ঠিক জানি না, পড়েছেন?

পড়েছি।

রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' ?

পড়েছি।

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কুচকুচে কালো লম্বা একটা বাঘিনী আছে, দেখেছেন ?

দেখেছি।

অমাবস্যার অন্ধকার দেখেছেন একা মাঠে দাঁড়িয়ে কখনও ?

দেখেছি।

চকচকে তলোয়ার দেখেছেন ?

দেখেছি।

চুম্বক ?

দেখেছি।

তা হ'লে এই সমস্তগুলির আত্মাকে আকাশের মত বিরাট একটা কটাহে একত্রিত ক'রে কোন জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর চাপিয়ে ডিস্‌টিল করতে থাকুন কল্পনায়।

তারপর একটু থেমে প্রশ্ন করলেন, করছেন ?

চেষ্টা করছি।

করুন। যা হবে, দেখবেন, তা ওই ড্রয়িং-রুম-মার্কা ছোট্ট চিকমিকে 'চমৎকার' কথাটা দিয়ে বর্ণনীয় নয়।

আবার একটু থেমে বললেন, 'সাংঘাতিক' বললে কিছু আভাস পাওয়া যায় হয়তো, তাও যৎসামান্য।

এর পর কি বলব, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কারণ নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রির একটা ঘোরতর রকম ঘনিষ্ঠ পরিচয় যে

ঘটেছে, তা অবিলম্বে বুঝতে পেরেছিলাম ; কিন্তু সেই ঘনিষ্ঠতার স্মৃতি আলোড়নযোগ্য কি না, তা ঠিক করতে পারছিলাম না। সাবধানতা অবলম্বন ক'রে বললাম, আপনার আত্মীয় যখন, তখন নিশ্চয়ই আপনি ভাল ক'রে চেনেন। আমার তো সে সুযোগ—

বিরক্তিকর! আবার আপনি একটা ভুল কথা ব্যবহার করলেন অজ্ঞাতসারে। রাত্রির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়াটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। আমার স্ত্রী ওর জন্যে আত্মহত্যা করেছে, আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে পালিয়ে বেঁচেছি।

এর পর চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় রইল না। দুজনেই নির্বাক হয়ে রইলাম। চারটে বুনো হাঁসের মধ্যস্থতায় এত বড় একটা সত্যের সম্মুখীন হতে পারব, তা আমি কল্পনাই করি নি। অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ নিখিলবাবু বললেন, এখনও কিন্তু ওকে আমি ভালবাসি। ভালবাসি, ঘৃণাও করি। বিরক্তিকর!

বললাম অর্থাৎ না ব'লে পারলাম না, আপনার সঙ্গে ওদের যা সম্পর্ক, তাতে অনায়াসেই তো ওকে বিয়ে করতে পারতেন আপনি।

দুটো বাধা ছিল। প্রথমত, পূর্ণেন্দুবাবু, পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী, রাত্রি এরা ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে, অন্তত আমার তাই ধারণা ; আর দ্বিতীয়ত, আমিও ঠিক সেই ধরনের উদার লোক নই, যে সব জেনে শুনে একটা প্রেম-করা মেয়েকে বিয়ে করতে পারে।

একটু ইতস্তত ক'রে একটু হেসে বললাম, কিন্তু প্রেম তো আপনার সঙ্গেই হয়েছিল।

নিখিল সশব্দে আর এক টিপ নস্য টেনে নিলেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, রাত্রির আকাশে অগণিত নক্ষত্র। আবার একটু থেমে, দিনের আকাশেও অগণিত নক্ষত্র, কিন্তু দেখা যায় না। তারপর অস্ফুটকণ্ঠে 'বিরক্তিকর' কথাটা হয়তো উচ্চারণ করেছিলেন নিখিল চৌধুরী, কিন্তু গোলমালে আমি শুনতে পাই নি, একটা দ্রুতগামী লরির ঘড়ঘড় শব্দের তলায় শেষের দিকের কয়েকটা কথা চাপা প'ড়ে গিয়েছিল।

নিখিলবাবুর মুখে সেদিন যা শুনেছিলাম, সেই স্মৃতির সঙ্গে আর একটা শ্রুতি-স্মৃতি মিলিয়ে দেখছি। একদিন লুকিয়ে তার কান্না শুনেছিলাম। নিখিল চৌধুরী-বর্ণিত অগণ্য নক্ষত্রময়ী রাত্রির পাশে মেঘভারাক্রান্ত বর্ষণমুখর রাত্রির ছবিটি রেখে বিস্মিত হয়ে দেখছি। এই বাড়িতেই গভীর রাত্রের নির্জন অন্ধকারে ওই পাশের ঘরটায় সে লুকিয়ে কাঁদছিল। এই ছাতেরই এক প্রান্তে আধখোলা জানলাটার পাশে অন্ধকারে আমি যে সবিস্ময়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা সে জানত না। মাঝে মাঝে ভাবি, জানলে সে কি করত? হয়তো হেসে উঠত। তার কলকণ্ঠের অট্টহাস্য ভীরু অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে বিদ্যুতের মত ঝকমক ক'রে উঠত হয়তো। কিন্তু সে দেখতে পায় নি। আমি কিন্তু দেখেছি, শুনেছি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে প'ড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে।

আমি জানতাম না, (এখনও অবশ্য কতটুকুই বা জানি !) তাই একটু সসঙ্কোচে নিখিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, অবনীশ, জ্যোতির্ময় কি তখনও ছিল ?

না, এদের নাম তখন শুনি নি, অন্তত মনে পড়ছে না। তখন ছিল খগেন, সৌম্যেন্দ্র, তপেশ, জমীর ব'লে এক মুসলমান ছোকরা, হারুবাবু নামে এক বুড়ো ডেপুটি, আর নিখিল চৌধুরী। অর্থাৎ এদের কথা আমি জানতাম, আরও অনেক ছিল নিশ্চয়। একটু থেমে আবার বললেন, ওদের বাড়িটায় পুরুষদের একটা মস্ত আড্ডা ছিল যে তখন।

আড্ডা ছিল ?

রীতিমত। হবে না ? যে বাড়িতে অমন চমৎকার চা তৈরি হয় এবং তা যখন খুশি গেলে পাওয়া যায়, যে বাড়িতে বাজি রেখে ব্রিজ খেলা হয় এবং খেলার সঙ্গিনী হিসেবে রাত্রির মত মেয়েকে পাওয়া যায়, যে বাড়ির গিন্নী, গড নোজ হোয়াই, সংসার ছেড়ে তীর্থে তীর্থে গুরুদেবের সেবা ক'রে বেড়ান, যে বাড়ির কর্তার সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সে বাড়িতে পুরুষ-মানুষের, মানে আমাদের মত পুরুষমানুষের আড্ডা হবে না তো কি হবে ?

কোথায় ছিলেন আপনারা তখন ?

এই কলকাতা শহরেই। পূর্ণেন্দুবাবু তখন ছ মাসের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছিলেন।

তখনও পক্ষাঘাত হয় নি তাঁর ?

আরে না না, তখনও তিনি রকেটের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন। বছর তিনেক আগে আর কি।

নিখিল চৌধুরী আবার একবার নস্যি নিলেন।

আমি তখনও সিগারেট ধরি নি, অন্যমনস্কভাবে গোঁফের ডগাটা পাকাতে লাগলাম।

বিরক্তিকর !

নিখিলবাবু উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

স্বর্ণেন্দুও কি আপনাদের আড্ডায় যোগ দিত ?

না। সে ছিল লক্ষ্ণৌয়ে, এম. এ. পড়ছিল।

ও তো স্কটিশে আমার সঙ্গে পড়ত।

পরে লক্ষ্ণৌ চ'লে যায়।

স্বর্ণেন্দু আমাব সঙ্গে কিছুদিন এক কলেজে পড়েছিল ব'লে তাকে যতটা আপন ব'লে মনে হচ্ছিল, এই সামান্য সংবাদটায় সেই আত্মীয়-ভাবটা কেমন যেন খানিকটা ক'মে গেল। আমি ভাবছিলাম—

হঠাৎ ছ ফুট লম্বা নিখিল চৌধুরী আমার দুই কাঁধে থাবাব মত দুটো হাত রেখে বললেন, সাবধান হোন।

এ অবস্থায় সাধারণত লোকে যা করে—ভাষার সাহায্যে আত্মগোপন—আমি তাই করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হ'ল না, চামেলি এসে বললে, খাবার দেওয়া হয়েছে।

দুজনেই নীচে নেমে গেলাম।

এমন চমৎকার 'ডাক-রোস্ট' আমি আর কখনও খাই নি। নিখিলবাবু কিন্তু দেখলাম খুব খুশি হন নি। কেমন যেন খুঁত-খুঁত করতে লাগলেন এবং অতি সব তুচ্ছ কারণ আবিষ্কার ক'রে চামেলিকে ধমকাতে লাগলেন। পরে জেনেছিলাম, এইটেই তাঁর ভালবাসা প্রকাশের ধরন। তিনি তাঁর এই ছিপছিপে কালো কাহার ভৃত্যটিকে অত্যন্ত ভালবাসেন ব'লেই তুচ্ছ অলীক কারণে তাকে ধমকান। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত নিখিল চৌধুরীও অবশ্য নিজেকে লুকোতে পারেন নি, চামেলি সব বুঝত। নিখিলবাবু যখন তাকে ধমকাচ্ছিলেন, তখন তাঁর সামনে যদিও সে শুষ্কমুখে অপরাধীর মত ভাব প্রকাশ করছিল, কিন্তু আড়ালে মুখ টিপে হাসছিল।

যেন ছাতে কোন আরব্ধ কর্ম অসমাপ্ত রেখে আমরা নেবে এসেছিলাম, এমনই একটা মনোভাব নিয়ে খাওয়া শেষ হতেই যন্ত্রচালিতবৎ আবার আমরা দুজনে ছাতে এসে বসলাম। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সেই রইলাম—যদিও দুজনেই একই কথা ভাবছিলাম, এবং আশ্চর্যের বিষয়, দুজনেই তা বুঝতে পারছিলাম। নিখিলবাবুর একটা কথা ঘুরে ফিরে কেবলই আমার মনে হচ্ছিল—এরা কেউ ঠিক সেই জাতের লোক নয়, যারা যেন-তেন-প্রকারেণ বিয়ে হওয়াটাকেই পরমার্থ মনে করে। কথাগুলোর নানা রকম অর্থ করা যায়। আমার সহসা কৌতূহল হ'ল, নিখিলবাবু কি অর্থে কথাগুলো ব্যবহার করলেন, কে জানে!

কৌতূহলটাকে বাঙ্ময় করলাম যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক আকার দিয়ে এবং নিরুৎসুক কণ্ঠে।

মেয়েরা একটু বড় হয়ে গেলে, আজকালকার দিনে, যাকে তাকে বিয়ে করতে চায় না। স্বর্ণেন্দুর কথাটারই পুনরুক্তি করলাম, তাদেরও একটা পছন্দ অপছন্দ আছে তো!

বড় মানে কি, কত বয়সের মেয়েকে আপনি বড় বলেন?

শুধু নিখিল চৌধুরীই নয়, অনেকেই দেখেছি, কোন একটা জিনিস বুঝেও যখন না বুঝতে চান, তখন তাঁরা এই ধরনের প্রশ্ন করেন। পৃথিবীতে প্রায় সব জিনিসেরই ব্যতিক্রম আছে—এই সত্যটার সুযোগ নিয়ে তাঁরা প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করবার প্রয়াস পান। হ'লও তাই।

আমি যেই বললাম, এই ধরুন ষোল-সতরো, শিকারের ওপর ঝম্পোন্মুখ শিকারী পশুর চোখে যে দৃষ্টি ফুটে ওঠে, নিখিল চৌধুরীর চোখেও ঠিক সেই দৃষ্টি ফুটে উঠল। এক টিপ নস্যি তুলে নিয়ে বললেন, তার ঢের আগে আপনার ওই রাত্রি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যের চোটে সকলের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল একদিন। তখন ওর বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে।

সশব্দে নস্যিটা টেনে নিলেন।

হয়েছিল কি?

বিয়ের কনে পিঁড়ি থেকে উঠে পালিয়েছিল, বরের কানে একটু খুঁত ছিল ব'লে।

কানে?

হ্যাঁ, কানে। ঠিক কাটা নয়, কানটা একটু মোড়া-গোছের ছিল।

কি রকম?

পূর্ণেন্দুবাবু যখন আশীর্বাদ করতে যান, তখন সেটা পাগড়ি দিয়ে ঢাকা ছিল ব'লে দেখা যায় নি।

আশীর্বাদ করবার সময় বর পাগড়ি প'রে ছিল নাকি?

হ্যাঁ। ছেলেটি পশ্চিমেই মানুষ, পশ্চিমেই থাকত, তাই পাগড়ি-পরাটা তার পক্ষে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়েছিল তখন সকলের। আসল কারণটা বোঝা গেল বিয়ের ঠিক আগে, টোপর পরবার সময়।

নিখিল চুপ করলেন।

আমি বলতে গেলাম, জোচ্চোরকে বিয়ে না ক'রে তো ঠিকই—

বিরক্তিকর! আমি কি বলেছি, বেঠিক করেছিল? আমার বক্তব্য শুধু এই যে, অন্য কোন মেয়ে ঠিক এমনটা করত না ওই বয়সে।

আমি মানস-চক্ষে দেখতে পেলাম ছবিটা। টোপর-পরা বরের মুখের দিকে ক্ষণকাল নিষ্পলক নয়নে চেয়ে থেকে তারপর উঠে গেল সে। পরনে লাল চেলী, কপালে কনে-চন্দন।

পূর্ণেন্দুবাবু সেই একটিবার মাত্র সম্বন্ধ ক'রে ওর বিয়ের চেষ্টা করেছিলেন, আর করেন নি। একটু থেমে নিখিলবাবু আবার বললেন, ওর মায়ের জন্যে আর সম্ভবও হয় নি।

মায়ের বিয়ে দিতে আপত্তি ছিল নাকি খুব?

নিখিল চৌধুরী এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানতেন কি না এবং জানলেও দিতেন কি না জানি না; কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে টং-টং ক'রে বারোটা বেজে উঠতেই দুজনে প্রসঙ্গান্তরে উপনীত হতে বাধ্য হলাম। নিখিলবাবু বললেন, বিরক্তিকর! কাল আবার সকালেই কোর্ট আছে আমার।

আমারও একটি রোগীকে ভোরেই ইন্‌জেক্‌শন দেবার কথা ছিল। সুতরাং উঠতে হ'ল। কিন্তু বেশ মনে আছে, নিতান্ত অনিচ্ছাসহকারেই উঠেছিলাম সেদিন। নিখিলবাবুকে এতক্ষণ ধ'রে একা পাবার সুযোগ আর একদিন মাত্র ঘটেছিল আমার। সেদিনও প্রসঙ্গ এই, কিন্তু 'পরিস্থিতি' বিভিন্ন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

আমি গোড়াতেই বলেছি, রাত্রির সবটা আমি দেখি নি। কিছুটা দেখেছি, কিছুটা শুনেছি এবং অনেকখানি কল্পনা করেছি। যদিও সকলের সম্বন্ধেই আমাদেব জ্ঞান এই তিনটি জিনিসের-যোগ-বিয়োগের ফল, তবু রাত্রির সম্বন্ধে এ কথাটা আরও বেশি ক'রে মনে রাখা উচিত এই কারণে যে, এ ক্ষেত্রে যোগ-বিয়োগের ফলে যে ধারণাটা আমাদের মনে স্থায়ী হবার সম্ভাবনা, সে ধারণাটার স্বরূপ সমাজ-স্বার্থের দিক থেকে; কিন্তু—

না থাক্। বাক্যের আবর্তে আপনাদের সহজ বুদ্ধিকে ঘুলিয়ে তুলতে চাই না। আমি ঘটনাগুলির যথাযথ বর্ণনা ক'রে যাচ্ছি, আপনারা নিজেরাই নিজেদের স্বকীয়তা অনুযায়ী স্বাধীন সিদ্ধান্তে উপনীত হোন। কেবল সত্যনিষ্ঠার খাতিরে এইটুকু শুধু আমি বলছি যে, ঘটনাগুলির মধ্যে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। 'যথাযথ' শব্দটাকেও বৈজ্ঞানিক অর্থে নিলে চলবে না। নারীর সম্বন্ধে পুরুষের বর্ণনা কখনও যথাযথ হতে পেরেছে? 'পারম্পর্য নেই'—এ কথাটা যে তুচ্ছ করবার মত নয়, একটা উদাহরণ দিলে তা আরও স্পষ্ট হবে। বিছুটি-লতার সুনাম নেই। মনে করা যাক, আপনি এই বিছুটির পাতা দেখেছেন, শিকড় দেখেছেন, বীজ দেখেছেন, অখ্যাতি শুনেছেন এবং সংস্পর্শও লাভ করেছেন, কিন্তু বিছুটির জীবনের সেই কটা দিন হয়তো আপনি দেখেন নি, যখন সে ফুলে ফুলে মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। বনে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যদি পুষ্পালঙ্কৃতা রূপান্তরিতা বিছুটিকে একটু দূর থেকে দাঁড়িয়ে কোন দিন দেখতেন, তা হ'লে হয়তো বিছুটির সম্বন্ধে আপনার ভূতপূর্ব তিক্ত ধারণায় হঠাৎ খানিকটা মাধুর্য-সঞ্চার হ'ত। আপনার অজ্ঞাতসারেই বিছুটির বিজ্ঞানসম্মত বদনাম সত্ত্বেও আপনার মন অনেক রকম দার্শনিক তথ্য, সত্য-অসত্যের অভিন্নতা, স্বপ্নের বাস্তবতা, আপাতদৃষ্টির সীমাবদ্ধতা—নানা রকম উদ্ভট আলো-আঁধারির মোহ সৃজন ক'রে অসহায় আত্মহারা ভাবে বিছুটির পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে যুক্তি আহরণ করতে ব্যস্ত হ'ত। অর্থাৎ

বিছুটি নামক বিষাক্ত উদ্ভিদটির জীবনের ঘটনা-পরম্পরা পর পর দেখবার সুযোগ যদি কারও ঘটে, তা হ'লে বিছুটির ওপর চ'টে থাকা অসম্ভব হবে তার পক্ষে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিছুটির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি বিছুটির জীবনে স্বল্পকাল থাকে এবং অধিকাংশ লোকের তা নয়নপথবর্তী হয় না।

আমি যে রাত্রির পূর্ণ পুষ্পিত রূপটি দেখতে পেয়েছিলাম তা নয়, কিন্তু কল্পনা করতে ক্ষতি কি, বিশেষত সে কল্পনার যখন অতি স্বাভাবিক একটা ভিত্তি আছে। নিখাদ বাঙালী ধরণী-বাবুও কল্পনা করেন, 'ওদের কূল-কিনারা পাবেন না মশায়, ওরা বাঙালী নয়, ওরা আলাদা জাতের লোক।' আমারই বা কল্পনা করতে বাধা কি যে, রাত্রির জীবনেও একদিন অতিশয় স্বাভাবিক নিয়মে অজস্র ফুল ফুটে উঠেছিল, যে ফুলের সৌরভ শুধু অলিকুলকেই নয়, রাত্রিকেও আবিষ্ট করেছিল, যে আবেশের মোহে সে ভেবেছিল, অলিদের নয়, বসন্তকেই সে বন্দী ক'রে রাখতে পারবে তার পুষ্পিত কারাগারে!

আমার বিশ্বাস, স্বর্ণেন্দু তার এই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপটি দেখেছিল, শুধু দেখে নি, মিলিয়ে দেখেছিল তার নিজের অপুষ্পিত ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে। তা না হ'লে—কিংবা হয়তো তার মায়ের কথা— না, কারণটা এখনও ঠিক জানি না আমি। কিন্তু স্বর্ণেন্দুর, সেই আদর্শবাদী স্বর্ণেন্দুর নিষ্পাপ মুখচ্ছবিটা ভুলতে পারি না আমি কিছুতে। অতিশয় শান্তভাবে কেবল সে বলেছিল, আমি করেছি। কোন উত্তেজনা, কোন বাহাদুরি,

কোন উত্তাপ ছিল না তার কণ্ঠস্বরে। তাই আমার মনে হয়, রাত্রির পুষ্পিত জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যর্থ জীবন সে মিলিয়ে দেখেছিল এবং—। কিন্তু এসব আমার কল্পনা। ঘটনাটা শুনুন।

নিখিলবাবুর সঙ্গে রাত্রিদের সম্বন্ধে আলোচনা হবার প্রায় ছ মাস পরে ঘটনাটা ঘটেছিল। এই ছ মাস আমি এদের কারও কোন খবর পাই নি, রাখিও নি। সেদিন রাত্রে নিখিল-বাবুর সাবধান-বাণী অনুসরণ ক'রেই যে আমি এদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়েছিলাম তা নয়, ধরণীবাবুর আলোচনা শুনেও আমার মনে জুগুপ্সার সঞ্চার হয় নি, রাত্রির সম্বন্ধে আমার ঔৎসুক্য এতটুকু কমে নি, বরং বেড়েছিল; তবু এদের সম্বন্ধে সচেষ্ট হয়ে কোন সংবাদ সংগ্রহ করি নি—সম্ভবত মজ্জাগত সেই স্বভাবের প্রভাবে, যার জন্যে আমরা সচেষ্ট হয়ে কোন কিছুই করি না। যা চোখে পড়ে তাই দেখি, যা কানে ঢোকে তাই শুনি। এখন আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, এই ছ মাসের খবর যদি আমি রাখতাম, অন্তত চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান যদি চলত, তা হ'লে হয়তো খবরের কাগজে কাহিনীটা যত বীভৎসভাবে বেরিয়েছিল, আমি তার প্রতিবাদ করতে পারতাম; এবং এই কাহিনীতে কল্পনায় যে সত্যটা অনুভব করছি, প্রত্যক্ষ-দর্শনের জোর পেলে—কিংবা হয়তো ভুল বলছি—প্রত্যক্ষদর্শনের উগ্রতাটা এত বেশি যে, তার দাপটে সূক্ষ্ম সত্য অনেক সময় মারা পড়ে। কল্পনার সূক্ষ্ম জালেই সূক্ষ্ম সত্য ধরা যায়। সবটা

প্রত্যক্ষদর্শন করলে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার প্রবৃত্তিই থাকত না হয়তো।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিস্পেন্সারি থেকে ফিরলাম প্রায় সাতটার পর। নানা কারণে মনটা ভাল ছিল না। দিন সাতেকের মধ্যে দুটো রুগী মরেছিল, আরও দুটো মর-মর হয়েছিল, একজন বড়লোক ভাটিয়ার বাড়িতে দুটো সঙিন-গোছের ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। অল্পদিন মাত্র ঘরটায় ঢুকেছিলাম, দু-দুটো মৃত্যু ঘ'টে গেলে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির সঙিনতার নয়, আমারই বদনাম হবে। ঘোষেদের বাড়ির টাইফয়েডটাকে পথ্য দিয়েছিলাম, বিকেলের দিকে শোনা গেল, তার একটু জ্বর হয়েছে। সকালবেলা শুভ-বিবাহ-মার্কা যে নেমন্তন্নের চিঠিখানা পকেটে পুরেছিলাম সেটার কথা মনেই ছিল না। বাড়ি ফিরে পকেট থেকে স্টেথস্কোপ বার করতে গিয়ে চিঠিখানা বেরিয়ে পড়ল। বিরক্তিতে সারা মনটা ভ'রে গেল। না গিয়ে উপায় নেই। শুধু যেতে হবে তা নয়, একটা উপহার কিনে নিয়ে যেতে হবে। এড়াবার উপায় নেই, কারণ ধনী জমিদার রায় মশায় একজন মস্তবড় পেট্রন আমার। তাঁর একমাত্র কন্যার বিবাহে কোমরে গামছা বেঁধে দই পরিবেশন করতেই লেগে যাওয়া উচিত ছিল আমার। অন্তত টাকা পাঁচেকের মত দিশী বিলিতী জাপানী জার্মানী যাই হোক কিছু একটা শৌখিন দ্রব্য কিনে ঠোঁটে ভদ্রতার হাসিটি ঝুলিয়ে আত্মীয়তার অভিনয় করতেই হবে গিয়ে। অভিনয় করা শক্ত হবে না, কিন্তু কি জিনিস কেনা যায়

তাই একটা সমস্যা। কারণ জিনিসটা তো আর অভিনয় করবে না। ফুলদানি, টয়লেট-সেট, টী-সেট, নিটিং-সেট, রাইটিং-সেট —নানা রকম সেটের কথা মনে হ'ল কিন্তু একটাও মনঃপূত হ'ল না। শাড়ির কথা চিন্তা করাও বাতুলতা। পাঁচ টাকা দামের শাড়ি রায় মশায়ের মেয়ে ক্বচিৎ কখনও পরলেও পরতে পারে হয়তো, কিন্তু সে শাড়ি উপহারের ভিড়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে না। আর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যেই তো উপহার দেওয়া। মনে হ'ল, তেমন কিছু পাঁচ টাকার মধ্যে পাওয়া অসম্ভব। মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল। ধড়াচূড়া ছেড়ে স্নান করলাম। স্নানান্তে এক কাপ চা খেয়ে একটু প্রফুল্লিত হলাম। মনে হ'ল, দুলাল সাধুর শরণাপন্ন হ'লে সে পাঁচ টাকার মধ্যেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারবে। গোটা পাঁচেক টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়ছিলাম, গোকুল এসে পথরোধ করলে।

আজ রায়েদের বাড়ি নেমন্তন্ন না তোমার ?

সেইখানেই তো যাচ্ছি।

কাপড়-চোপড়গুলো বদলে যাও, ওরকম ময়লা জামা-কাপড় প'রে নেমন্তন্ন খেতে যায় নাকি কেউ ?

জানি, প্রতিবাদ করা বৃথা।

বললাম, শিগগির দে তা হ'লে।

গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, বাবুধাক্কা-পাড় কাপড়, ফিতে-বসানো পেটেন্ট লেদারের কালো পাম্প-শু, মায় রূপো দিয়ে

বাঁধানো শৌখিন ছড়িটি পর্যন্ত এনে হাজির করলে গোকুল। আলমারি খুলে এসেন্সের শিশি বার ক'রে পাট-করা রুমালে এসেন্সও ঢালতে লাগল। পৃথিবীতে এত লোকেরই যখন মন রেখে চলেছি, বস্তুত সমাজ-জীবন মানেই যখন এক-নাগাড়ে সকলের মন রেখে চলা, তখন গোকুলকেই বা মনঃক্ষুণ্ণ করি কেন? কোন আপত্তি করলাম না।

বেশি রাত ক'রো না যেন।

আচ্ছা।

তখন কি জানি, রাত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে!

আমার সচেতন সত্তা জানত না যদিও, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, অবচেতন মনের কোন স্তরে সংবাদটা এসে পৌঁছেছিল বোধ হয়, এবং সেইজন্যেই আমি বোধ হয় আমার কিছুক্ষণ আগেকার উপহার-বিরোধী মনোবৃত্তি সত্ত্বেও—না, ভুল বলছি—আসলে সেটা দুলাল সাধুর কীর্তি। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েই সোজা সেই মনিহারী দোকানটির উদ্দেশ্যে প্রধাবিত হলাম, যার একচ্ছত্র মালিক শ্রীদুলালচন্দ্র সাধু। একাধিক কারণে দুলাল সাধুর অসাধুতার নানা প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আমি সব জিনিস তার দোকান থেকেই কিনি। প্রথমেই বলেছি, চোখের দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে। দুলাল সাধুর চোখ দেখেই প্রথমে আকৃষ্ট হয়েছিলাম তার প্রতি। বড় ট্যারা চোখ। যখন মনে হবে, দুলাল সাধু রাস্তার ষাঁড়টার দিকে চেয়ে আছে, তখন কিন্তু সে নিরীক্ষণ করছে আপনাকে। যখন তার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আকস্মিক

ভৎ´সনা ঘনিয়ে উঠতে দেখে আপনার মনে আতঙ্ক-সঞ্চার হচ্ছে, তখন তার 'মাপ কর বাবা, এখানে হবে না' শুনে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে প্রত্যাখ্যাত ভিখারীটাকে দেখে আশ্বস্ত হবেন। ওর অদ্ভুত ট্যারা চোখই আকৃষ্ট করেছিল আমাকে প্রথমে। পরিচয় পেয়ে আরও আকৃষ্ট হলাম। অতি অমায়িক লোক। যখন গলা কাটছে, তখনও অমায়িক। পৃথিবীতে গলা তো সকলেই কাটে, অমায়িক কজন হয়? আমার বিশ্বাস, এটা ওর নিছক ভণ্ডামির আবরণ নয়, এটা ওর বিশেষ একটা গুণ। 'আপনি হলেন ঘরের লোক'—এটা শুধু ওর মুখের কথা নয়, আচরণেও সেটা ফুটিয়ে তোলার শক্তি আছে ওর। কেবল মুখের কথায় মানুষ বরাবর ভোলে না, খানিকটা আন্তরিকতাও থাকা চাই।

তৃতীয়ত, ধার দেয়। সকলকে দেয় না, লোক বুঝে দেয়। দুলাল সাধুর এইটে একটা আশ্চর্য ক্ষমতা। ট্যারা চোখের এক চাউনিতেই ও বুঝে নেয়, লোকটা কোন্ জাতের, একে ধার দেওয়া চলে কি না।

আমি যখন দুলাল সাধুর দোকানে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন বেচারা ভারি ব্যস্ত। নানা রঙের শাড়ি-পরা এক ঝাঁক কলেজের মেয়ে তাকে ঘিরে ছিল। দুলাল যে কখন কার মুখের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, তা বোঝবার উপায় ছিল না। তবে এটা ঠিক, ফরসা লম্বা মেয়েটি যখন মনে মনে ঈষৎ আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে করতে মুখে একটা বিরক্ত ভাব প্রকাশ করছিল, তখন

দুলাল তাকে দেখছিল না, তখন দুলালের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল খুব সম্ভব বাঁ ধারের শ্যামবর্ণাটির ওপর। শ্যামবর্ণা মেয়েটি নিজেকে যখন বিব্রত মনে করতে লাগল, তখন দুলালের দৃষ্টি পড়েছে আমার ওপর—

আসুন আসুন ডাক্তারবাবু, আসুন, বসুন।

বসব না আর, আমাকে টাকা পাঁচেকের মত কিছু একটা দিন তো—বিয়ের উপহার।

এক মিনিট, এক্ষুনি দিচ্ছি। ওরে ভোঁদড়, পান দে ডাক্তারবাবুকে।

বলা বাহুল্য, একাধিক মিনিট বসতে হ'ল।

ব'সে ব'সে লক্ষ্য করতে লাগলাম মেয়েগুলিকেই। মুগ্ধ নয়, ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম। নানা রকম লোভনীয় মনিহারী জিনিসের দিকে সঞ্চরমান ওদের দৃষ্টিতে সেদিন যে লুব্ধতা আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা ভুলব না কোন দিন। চোখ দিয়ে ওরা জিনিস-গুলোকে গিলছিল যেন। এক-একবার মনে হচ্ছিল, আমার যথাসর্বস্ব খরচ ক'রে কিনে দিই ওদের জিনিসগুলো। ট্যারা দুলাল সাধুর সামনে ওদের ওই লুব্ধতা আমারই আত্মসম্মানকে ক্ষুণ্ণ করছিল যেন। কিন্তু আমার যথাসর্বস্ব আর কতটুকু! খুব বেশিও যদি থাকত, তা হ'লেও ওদের তৃপ্ত করতে পারতাম না। হুতাশনকে ঘি খাইয়ে তৃপ্ত করবে কে? অনেক দর-কষাকষি ক'রে (সেদিন এটাও লক্ষ্য করেছিলাম, এ বিষয়ে মেয়েরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি পটু) একখানি মাত্র শাড়ি কিনে চ'লে

গেল ওরা। শাড়ির দরকার ছিল একজনের, বাকি কজন বোধ হয় পছন্দ করতে এসেছিল।

এইবার ডাক্তারবাবু, আপনাকে কি দোব বলুন? ওহে জগু, ফ্যানটা খুলে দাও ওদিকেব।

টাকা পাঁচেকের মত যা হোক একটা কিছু দিন শৌখিন-গোছের, বিয়েতে উপহার।

সসম্ভ্রমে দুলাল বললে, রায়েদের বাড়ির জন্যে বুঝি?

হ্যাঁ।

সামনের তাকে রক্ষিত গণেশের দিকে চেয়ে দুলাল হুকুম করলে, ওহে চণ্ডী, ওপর থেকে নিকেলের ইলেকট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আন তো, সাবধানে এনো।

একটু পবে চণ্ডী নিকেলেব ইলেকট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা নাবিয়ে আনলে এবং দুলাল সাধু সসম্ভ্রমে সেটা খুলে দেখাতে লাগল।

এর পাঁচ টাকা দাম?

দাম কিছু বেশি। কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমাব দোকান থেকে জিনিস যাবে, দামের দিকে লক্ষ্য রাখলে তো চলবে না আমার।

শাড়ি-ব্লাউজ-পরা ডামিটার দিকে চেয়ে দুলাল সাধু মুচকি হেসে এমন একটা ভাব প্রকাশ করলে, যা সত্যিই অবর্ণনীয়। তবু আমি শেষ চেষ্টা করলাম, আমার সঙ্গে পাঁচ টাকার বেশি নেই যে!

দাম আপনি যখন খুশি দেবেন, নাও যদি দেন তাও সহ্য হবে আমার, কিন্তু রায়েদের বাড়িতে আপনার হাত দিয়ে আমার দোকান থেকে চার-পাঁচ টাকা দামের খেলো জাপানী জিনিস পাঠাতে পারব না আমি।

ডামিটার দিকে এমন মর্মাহতভাবে চাইলে দুলাল সাধু যে, আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না।

সকলেই প্রশংসা করেছিল আইসক্রীম-সেটটার। রাত্রি প্রশংসা করেছিল আমার রুচির। বছর-খানেক পরে দুলাল বিল পাঠিয়েছিল—চল্লিশ টাকা পনরো আনা।

রায় মশায় আমাদের পাড়ার বর্ধিষ্ণু লোক। সুতরাং এ পাড়ার অতি-পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, অপরিচিত সকলকেই প্রায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাইরের লোকও অনেক ছিল। শামিয়ানার তলায়, টিনের চেয়ারে, বৈঠকখানা-ঘরের বিস্তৃত ফরাশে, বারান্দায়, সামনের একটা তাঁবুতে, চতুর্দিকে গিজগিজ করছিল নিমন্ত্রিতের দল। কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেক্‌ট্রো-প্লেটেড আইসক্রীম-সেট সহ আমিও গিয়ে যোগ দিলাম। ভাগ্যে গেটে কেউ এসে আটকায় নি, কারণ যে কার্ডখানা গেটে প্রদর্শন করবার কথা সেটা আমি আনতে ভুলেছিলাম।

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, কনসার্ট, লাল নীল হলুদ সবুজ ইলেক্‌ট্রিক আলোর সারি, কুকুরের চীৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকরা-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নজনিত চেঁচামেচি—সমস্তটা মিলে একটা প্রলাপ যেন।

খানিকক্ষণ পরে আর একটা প্রলাপ যে আমাকে শুনতে হবে—বংশীর প্রলাপ—তা তখন কে জানত!

২

বংশী যে প্রলাপ বকবে, তা বোধ হয় রাত্রিও জানত না, জানলে সে আমাকে নিয়ে যেত না সঙ্গে ক'রে। অবশ্য রাত্রি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল, এটা ঠিক সত্য কথা নয়; আমিই তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। কিছুই সম্ভব হ'ত না, যদি কান্তি পালের সঙ্গে দেখা না হ'ত।

অগ্রগামী কুলীর মাথায় নিকেলের ইলেকট্রোপ্লেটেড আইস্-ক্রীম-সেট নিয়ে রায় মশায়ের বিরাট বাড়ির চৌহদ্দিতে যেই আমি ঢুকলাম, অমনই দেখা হয়ে গেল কান্তি পালের সঙ্গে। সেদিন কান্তি পালের সঙ্গে ওই ভিড়ের মধ্যে দেখা হয়ে যাওয়াটাকে আমি এখন আর আকস্মিক ব'লে মনে করি না। আমার মনে হয়, নিয়তির এই চক্রান্তের মধ্যে কান্তি পালের স্থান আগে থেকেই ঠিক করা ছিল।

কান্তি পাল লোকটি কান্তিমান লোক নন। রোগা বকের মত চেহারা। গোঁফ-দাড়ি কামানো,—কিন্তু নিয়মিতভাবে নয়, প্রত্যহ তো নয়ই। হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে নগ্নগাত্রে একখানা ভিজে লাল গামছা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেকে বীজন করছিলেন তিনি ম্যাগ্নোলিয়া-গ্রাণ্ডিফ্লোরা গাছটার আড়ালে দাঁড়িয়ে।

আমি তাঁকে দেখতে পাই নি। তিনিই এগিয়ে এসে বললেন, ডাক্তার যে, এস এস, কুলীর মাথায় ও কি ?

উপহার একটা।

ও নিতু, ডাক্তারবাবুর এই জিনিসটা মাঝের হল-ঘরে রাখিয়ে দাও—বেশ সামনের দিকে রাখিয়ে দিও।

নিতু এসে কুলীটাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল। হল-ঘরে উপহারের একটা প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল।

কান্তি পাল বললেন, উঃ, রগ দুটো যেন ছিঁড়ে পড়ছে আমার! আবার বনবন ক'রে গামছা ঘোরাতে লাগলেন এবং আমি কিছু বলবার আগেই বললেন, সকাল থেকে ক ব্যাটা উড়েকে নিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুনের সামনে—উঃ!

কান্তি পালকে আমি চিনি, তিনি আমার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করছিলেন, তাও আমার অবিদিত ছিল না। বললাম, আপনি ব'লেই পারেন এসব, আমরা হ'লে ম'রে যেতাম!

আর পারি না ভাই, বয়স তো হচ্ছে। চল, তোমাকে বসিয়ে দিইগে। ভিড়ের মধ্যে ঢুকো না, ওধারের বারান্দার কোণে একটা নিরিবিলি জায়গায় আছে, সেখানেই চল। একটা ফ্যানও আছে সেখানে, আরামে বসতে পারবে।

তারপর যেতে যেতে বললেন, উঃ, মনে হচ্ছে, দুটো রগে দুটো ইস্ক্রুপ কে যেন প্যাঁচকষ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাচ্ছে!

কান্তি পালের এই বৈশিষ্ট্য। শিবহীন যজ্ঞ বরং সম্ভব, কিন্তু এ পাড়ায় কান্তি-পাল-হীন 'যগ্যি' অসম্ভব। সকাল থেকেই

কোমরে গামছা বেঁধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি রান্নাবান্নার তদারকের ভার নিয়ে এগিয়ে যাবেন। তারপর যত বেলা বাড়তে থাকবে, কান্তি পাল তত গম্ভীর হতে থাকবেন এবং ক্রমশ চেনা-শোনা যার সঙ্গে দেখা হতে থাকবে, তার কাছেই চুপিচুপি ক্ষুণ্ণকণ্ঠে নিজের একটা না একটা শারীরিক অসুস্থতার উল্লেখ ক'রে 'ক্যাসাবিয়াঙ্কা'-মার্কা এমন একটা নিদারুণ রকম আবহাওয়া সৃষ্টি করবেন (গোপনে গোপনে কিন্তু) যে, শ্রোতাকে সহানুভূতি-মিশ্রিত দু-চারটে প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতেই হবে। কান্তি পাল এর বেশি আর কিছু চানও না। অসুখের প্রতিকারকল্পে কেউ যদি কোন ব্যবস্থা করতে যায়, কান্তি পাল বলবেন, না, থাক্। সমস্ত দিন রান্নাঘরে ঘোরা-ফেরা করবেন, কিচ্ছু খাবেন না এবং রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে এক গ্লাস শরবত কিংবা বড় জোর একটা মিষ্টি খেয়ে বাড়ি চ'লে যাবেন।

কান্তি পাল আমাকে নিয়ে গিয়ে যে স্থানটিতে বসিয়ে দিলেন, সে স্থানটি আমি এই ভিড়ের মধ্যে নিজে খুঁজে বার করতে পারতাম না এবং তা না পারলে পরবর্তী ঘটনাপরম্পরা আমার জীবনে ঘটত কি না সন্দেহ। আমার সহানুভূতিসূচক কথায় বিগলিত হয়ে কান্তি পাল যেখানে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেটা অতিথিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা নয়। সেটা পেছন দিকে অন্দর-মহলের কাছাকাছি একটা স্থান। খুব পরদানশীনও নয়, খুব প্রকাশ্যও নয়। মেয়েরাও বসতে পারে, পুরুষেরাও বসতে পারে। সেখানে ছিল একটা গোল টেবিলের চারপাশে খান

কয়েক চেয়ার, মাথার ওপরে একটা পাখা। আশপাশ দিয়ে লোক যাতায়াত করছিল বটে, কিন্তু সেখানে থামছিল না কেউ। এই ভিড়ের বাড়িতে এমন একটা জায়গা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ফ্যানটি খুলে দিয়ে কান্তি পাল মুচকি হেসে ব'লে গেলেন, ওদিক পানে চেয়ো না যেন।

তাঁর অঙ্গুলিনির্দেশে চেয়ে দেখলাম, একটু দূরে একটি বিস্তৃত ঘরে নিমন্ত্রিতা ভদ্রমহিলারা সমবেত হয়েছেন। একটা মৃদু গুঞ্জন উঠছে। তাঁরা আমাকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ মনে হ'ল, বুনো রামনাথের স্ত্রী এঁদের মধ্যে নেই। হাতে শাঁখা (এমন কি অভাবে লাল সুতো), সীমন্তে সিঁদুর, আর সাধারণ সাদাসিধে সুতোর কাপড় প'রে যে মহিলা সগৌরবে নিজের আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন, এই মেকী প্রজাপতির দলে তিনি নিশ্চয়ই নেই। বুনো রামনাথের স্ত্রীর আত্মমর্যাদার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত কেবল তাঁর স্বামীর ব্রাহ্মণত্বের প্রতি শ্রদ্ধার ওপর, আর এই মেকী প্রজাপতিদের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত কেবল তাদের স্বামীর উপার্জন কিংবা ধার করবার ক্ষমতার ওপরই নয়, সৎ-অসৎ ভদ্র-অভদ্র নানা উপায়ে সেটা জাহির করবার প্রচেষ্টার ওপর। এদের আত্মসম্মান পরিপুষ্ট হয় সোফা-সেটি-মোটর-বসন-ভূষণ কিনেই নয়, তা অধনী-অধন্যদের চোখের সামনে নানা ভাবে আস্ফালন ক'রে। অন্তরের ঐশ্বর্যের

কথা কেউ আজকাল ভাবেই না, বাইরের ঐশ্বর্যই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মানদণ্ড। তাই নানা রঙের কাপড় নানা ঢঙের গয়না প'রে, মুখে পাউডার ক্রীম ঘ'ষে, আন্তরিকতাবর্জিত হাসি হেসে প্রাণপণে সবাই অভিনয় ক'রে চলেছে। সবাই সবাইকে সমালোচনাও করছে মনে মনে, মুখের ভদ্র হাসিটুকু বজায় রেখে। কার স্বামী কেরানী এবং কার স্বামী সেই কেরানীর প্রভু, তা বোঝবার উপায় নেই তাঁদের স্ত্রীদের দেখে। গয়না-কাপড়ের দৌলতে সবাই রাজরাণী। পেট ভ'রে খায় না, মনুষ্যত্বের চর্চা করে না, যা কিছু রোজগার করে তা দিয়ে ঠুন্‌কো ঐশ্বর্যের সস্তা চাকচিক্য কিনে প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে। বুনো রামনাথের স্ত্রীর নিরলঙ্কৃত মর্যাদাবোধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে হয়তো এক রকম কম্‌প্লেক্স; কিন্তু এই দরিদ্র পরাধীন দেশে গয়না-কাপড়-সর্বস্ব ঝুটো আভিজাত্য-কম্‌প্লেক্সের চেয়ে দারিদ্র্য-কম্‌প্লেক্স ঢের বেশি শ্রেয় এবং সম্মানার্হ। আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের চেয়ে ঢের কম রোজগার ক'রে ঢের বেশি সুখে ছিলেন, কারণ তাঁদের মর্যাদাবোধ আর্থিক ছিল না, আত্মিক ছিল। সুখে জীবনযাপন করবার জন্যেই অর্থ, অর্থের জন্য জীবনযাপন নয়—এ কথা আমরা ভুলে গেছি ব'লেই যে কোন ধনী দুরাত্মার কাছে সামান্য অর্থের বিনিময়ে মাথা নোয়াতে পেলে ধন্য হয়ে যাই।

পলাশীর যুদ্ধ···রামমোহন রায়···বিদ্যাসাগর···বঙ্কিম···বিবেকানন্দ···রবীন্দ্রনাথ···একশো তিরাশি বছর মনের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে পার হয়ে গেল।

দিস ইজ ক্যালকাটা কলিং—

চাল-ডালের দর থেকে আরম্ভ ক'রে বড় বড় রাজ্যের উত্থান-পতনের সংবাদ, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য, সেতারে কানাড়ার আলাপ, মধ্যযুগের সাধনা, আবৃত্তি, নাটক, ফুটবল-খেলার ফলাফল তারস্বরে একের পর এক শূন্যে চীৎকার ক'রে মরছে—পানবিড়ির দোকানেও, মহারাজার প্রাসাদেও। আর এই গান! বাংলা ভাষা যারা বোঝে না, তারা হয়তো ভাবে, বাংলা দেশ জুড়ে মড়াকান্না উঠেছে। কিন্তু কাঁদবে কে? একটা মড়া কি আর একটা মড়ার শোকে কাঁদে কখনও? কান্না নয়, গানই হচ্ছে, ভাষা বুঝলে গানের কথায় মুগ্ধ হয়ে যেত, কেউ মরে নি, সবাই বেঁচে আছে এবং এত আনন্দে আছে যে, অষ্টপ্রহর গান গাইছে সবাই।

টর্চের আলো নিবিড় অন্ধকারকে বিদীর্ণ ক'রে দেয় যেমন ক'রে, আমার মনের তমিস্রাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে পাশের ঘরে তেমনই ফোন বেজে উঠল।

হ্যালো, কে আপনি? সবিতা দেবীর বাড়িতে স্বর্ণেন্দুবাবু খবর পাঠিয়েছেন? রাত্রিকে ডাকছেন? কি বলব তাঁকে? একা রুগী সামলাতে পারছেন না? আচ্ছা, আমি দেখছি। যিনি ফোন ধরেছিলেন, তিনি ওদিকের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাঁকে আমি দেখতেই পেলাম না। আমার মনে পর পর দুটো অসংলগ্ন চিন্তা জাগল—রায় মশায়ের সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি···রাত্রির সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হঠাৎ উঠে বারান্দার সিঁড়িটা দিয়ে হনহন ক'রে আমি লনে নেমে গেলাম, সম্ভবত সিঁড়িগুলো সামনে ছিল ব'লেই। লনের ওধার দিয়ে এক ছোকরা ট্রেতে সাজিয়ে শরবত নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে প্রশ্ন করলাম, রায় মশায় কোথায় বলতে পারেন ?

তিনি গেস্ট-হাউসে রয়েছেন। দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার আছেন কিনা সেখানে।

ছোকরা চ'লে গেল।

যদিও রায় মশায়ের নিমন্ত্রণেই এসেছিলাম, তবু— কিন্তু না, দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার থাকতে রায় মশায় আমাদের মত নগণ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সময় নষ্ট করবেন—এ কথা চিন্তা করাও অন্যায়, হলামই বা আমরা নিমন্ত্রিত। আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে লোকের অভাব নেই তো। এতবড় একটা রাজসূয় ব্যাপারে জনে জনে প্রত্যেককে আপ্যায়িত করা রায় মশায়ের পক্ষে সম্ভব কি ? আর, তা ছাড়া, আর একটা কথাও কি সত্য নয় যে, আমাকে নিমন্ত্রণ না করলে, কিংবা আমি না এলে, এ উৎসব এতটুকু অসম্পূর্ণ থাকত না ? আমাকে অনুগ্রহ করেন ব'লেই নিমন্ত্রণ করেছেন, না করলেও পারতেন।

সমস্ত তিক্ততা মুহূর্তে মাধুর্যে রূপান্তরিত হ'ল।

নমস্কার। আপনিও এসেছেন দেখছি।

চেয়ে দেখি, রাত্রি নির্নিমেষে আমার দিকে চেয়ে আছে, মুখে অতি ক্ষীণ হাস্যরেখা। তার পাশে আর একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটির রঙ এত অদ্ভুত রকম ফরসা যে, হঠাৎ দেখলে

ইহুদী ব'লে সন্দেহ হয়। তখন আমি জানতাম না, রাত্রি বিনা-নিমন্ত্রণেই এ বাড়িতে এসেছিল এই সবিতাকে দেখবে ব'লে। সবিতার বাড়ি গিয়ে দেখা পায় নি, সবিতা এখানে চ'লে এসেছিল নিমন্ত্রণ-রক্ষা করবার জন্যে, রাত্রিও খোঁজ নিয়ে এসেছিল। সবিতা ও রাত্রি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল—হ্যাঁ, সেই পুরাতন উপমাটাই ব্যবহার করছি—ঠিক যেন আলো আর অন্ধকার। রাত্রির মুখভাবে সেদিন অতি-ভদ্র অতি-মোলায়েম শিষ্টাচারমসৃণ যে স্নিগ্ধতা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল, তা যে অন্তরোৎসারিত নয়, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না সেদিন। দেশলাই-কাঠির কালো মাথাটার ভেতর আগুন যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে, রাত্রির মধ্যেও সেদিন তেমনই আগুন লুকনো ছিল, আমি বুঝি নি। সবিতার সঙ্গে রাত্রির যে সেদিন প্রথম আলাপ, রাত্রি নিজে যেচে এসে আলাপ করেছে, তাও আমি জানতাম না। কাল সকালে জ্যোতির্ময় এসে রাত্রিদের সঙ্গে একবার মাত্র দেখা ক'রে এই সবিতাদের বাড়িতেই উঠবে—এ কথাও তখন আমার অজ্ঞাত ছিল। রাত্রি দেখতে এসেছিল সবিতা মেয়েটি কেমন, একটা চুম্বক আর একটা চুম্বকের শক্তি-নির্ধারণ করতে এসেছিল।

আপনারা মধুপুর থেকে কবে এলেন?

দিন চারেক আগে।

রাত্রি না হয়ে যদি অপর কেউ হ'ত, তা হ'লে এই সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য খবরও বলত। আমার প্রশ্নটির উত্তরটুকু

মাত্র দিয়ে রাত্রি চুপ ক'রে রইল। আমি চেয়ে দেখলাম, সে সবিতার মুখের পানে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে, এবং সবিতা মেয়েটি অস্বস্তি ভোগ করছে সেজন্যে। আমিও কম অস্বস্তি ভোগ করছিলাম না। এর পর কি করব, কি কথা ব'লে আলাপটাকে স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাব, তাই ভাবছিলাম (রাত্রির সামনে বরাবরই আমার এমনই বাক্‌সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে), এমন সময় নিতু একটা কার্ড আর লাল পেন্সিল নিয়ে হাজির হ'ল।

আপনার নামটা কাইন্‌ড্‌লি বলুন না!

কেন?

আপনার দেওয়া আইসক্রীম-সেটটার সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে দোব।

সবিতা জিজ্ঞাসা করলেন, উপহারগুলো কোথায় রাখা হয়েছে, আমরা একবার দেখতে পাই না?

ওই যে, বাঁ দিকের ওই হলটায়। আসুন না।

সকলে নিতুর অনুসরণ করলাম।

উপহার-প্রদর্শনীর বর্ণনা ক'রে সময় নষ্ট করতে চাই না, মনিহারী দোকানে যত রকম জিনিস পাওয়া যায়, সবই ছিল সেখানে। রাত্রি নিকেলের ইলেক্‌ট্রোপ্লেটেড আইসক্রীম-সেটটা দেখে (নিতু আমার নাম-লেখা কার্ড ঝুলিয়ে দিচ্ছিল তখন) দুটি কথা মাত্র বলেছিল—বেশ জিনিসটি। তারপর হঠাৎ সবিতার দিকে ফিরে বলেছিল, ইনি বিখ্যাত গল্পলেখক

ডাক্তার ঘনশ্যাম সরকার। নমস্কার-প্রতিনমস্কারের পর মামুলি প্রথায় দু-চারটে শিষ্টবাণীর আদান-প্রদানও হয়তো চলত, কিন্তু হঠাৎ পাশের দুয়ারের পর্দা ঠেলে ব্যস্তবাগীশ-গোছের মালকোঁচা-মারা ঘর্মসিক্ত ঢিলে গেঞ্জি গায়ে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে পড়লেন এবং সবিতা দেবীকে সামনে পেয়ে বললেন, ও, সবিতা, তুমি এদিকে চ'লে এসেছ, স্বর্ণপ্রভাকে আমি আবার ভেতরের দিকে পাঠালাম তোমার খোঁজে। এখনই তোমাদের বাড়ি থেকে একজন ভদ্রলোক ফোন করছিলেন, রাত্রি ব'লে একজন মেয়েকে, আই মীন—মহিলাকে, স্বর্ণেন্দুবাবু ব'লে একজন ভদ্রলোক ডাকছেন। বললেন, তিনি রুগীকে একা সামলাতে পারছেন না। আমি তো রাত্রি ব'লে কাউকে খুঁজেই পাচ্ছি না।

ইনিই রাত্রি দেবী।

ও, নমস্কার।

ভদ্রলোককে আর কিছু বলবার অবকাশ না দিয়ে রাত্রি বললে, এখুনি যাচ্ছি আমি।

আমি কর্তব্যের অনুরোধেই সম্ভবত প্রশ্ন করলাম, বাড়িতে কারও অসুখ নাকি?

বংশীদার জ্বর হয়েছে।

হঠাৎ ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়বার ভান করলাম।

ও, বলেন তো আমিও যাই আপনার সঙ্গে।

বেশ তো, আসুন।

বেশ মনে পড়ছে, সবিতার দিকে ফিরে রাত্রি বলেছিল, কাল

ভোরেই জ্যোতির্ময়বাবু আসছেন, বেলা দশটা নাগাদ আপনাদের বাড়িতে যাবেন। আপনি যে আগেই চিঠি পেয়েছেন, তা আমি জানতাম না, তাই খবরটা দিতে এসেছিলাম।

হাস্যদীপ্ত চক্ষে সবিতা বললেন, অনেক ধন্যবাদ।

উপহার-প্রদর্শনী-হল থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা দুজনে।

৩

রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চীৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের কলরব, শামিয়ানার তলায় ভোজননিরত নিমন্ত্রিতের দল, পরিবেশনের গোলমাল, রেডিওর নিনাদ কয়েক মুহূর্তের জন্য ভোজবাজির মত মিলিয়ে গেল যেন আমার চোখেব সামনে থেকে ; মনে হ'ল, কেউ কোথাও নেই, রাত্রি আর আমি পাশাপাশি চলেছি। মুহূর্তগুলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের। মনে হচ্ছিল, যেন একটা সংকীর্ণ বনপথ দিয়ে নিবিড় অন্ধকার রজনীতে পাশাপাশি চলেছি দুজনে, রাত্রির অঞ্চলতলে শঙ্কিত ভীরু দীপশিখা,—বাতাস উঠেছে···। সহসা রোশনচৌকি, গোরার বাজনা, শানাই, লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেক্‌ট্রিক আলো, কুকুরের চীৎকার, মোটরের হর্ন, ছ্যাকড়া-গাড়ির গাড়োয়ানদের চীৎকার, পরিবেশনের কলরব, রেডিওর নিনাদ সব আবার একসঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল

যেন আমাব সচেতন মনের ওপর। দেখলাম, রাত্রি ঝুঁকে তার স্যাণ্ডালের স্থানচ্যুত স্ট্র্যাপটাকে বাঁধছে। রায় মশায়ের বাড়ির হাতা থেকে বেরিয়ে গেটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হঠাৎ তুলাল সাধুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলাম, টাকা পাঁচটা পকেটে আছে, ট্যাক্সি ডাকলাম।

ট্যাক্সিতে তার সঙ্গে আমার তুটি কথা হয়েছিল।

নতুন কোন বই শুরু করেছেন নাকি আর?

না।

যে বংশীর অসুখেব সংবাদে চিন্তিত হয়ে হিতৈষীর ছদ্মবেশে বিনা আহ্বানেই যাচ্ছিলাম, সেই বংশীর অসুখেব সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই উঠল না কোন দিক থেকে। নীরবেই ব'সে রইলাম তুজনে। আলোকোজ্জ্বল বড় বড় বাড়ি পেছনে ফেলে চলেছিলাম। ফুটপাথের জনতা থেকে একটি মেয়ের কলকণ্ঠেব উচ্ছ্বসিত হাসি শুনতে পেয়েছিলাম মনে আছে, কোণের অন্ধ ভিখারীটা তখনও হাত পেতে ব'সে ছিল, ট্রামেব ঘণ্টা, বিক্শা, হকারের চীৎকার, বাস্তার বিচিত্র জনতা বোজ যেমন থাকে সেদিনও তেমনই ছিল। আমিই ঠিক তেমনই ছিলাম না। রাত্রিকে পাশে বসিয়ে ট্যাক্সি ক'রে ছুটছিলাম আমি।···একটু পরে রাত্রির নির্দেশ অনুসারে থামল ট্যাক্সিটা। ভাগ্যে থামল। আর কিছুক্ষণ চললে আমি বোধ হয়— মানে, ট্যাক্সি থেকে যখন নাবলাম, মনে হ'ল, নক্ষত্রলোক থেকে নাবলাম।

এক পাশে একটা ডাস্টবিন আর এক পাশে একটা

ল্যাম্প-পোস্ট, মাঝখানে গলিটা। অন্ধকার সরু একটা অন্ধ-গলি। সেই গলির অপর প্রান্তে ছোট দ্বিতল বাড়িখানা, দেখতেই পাওয়া যায় না গলির এ প্রান্ত থেকে।

আসুন।

কপাট খুলতে প্রথমেই চোখে পড়ল এক জোড়া জ্বলন্ত চোখ, তারপর একটি তরুণীর মুখ, তারপর তার গৈরিক বসন। হ্যাঁ, প্রথমে তরুণীই মনে হয়েছিল তাঁকে আমার। তখনও ভাবতেই পারি নি যে, ইনি স্বর্ণেন্দুর মা, রাত্রির মা। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল, রাত্রির সমবয়সী। আমাকে দেখেই তাঁর চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। অতিশয় কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কে বাবা তুমি?

আমি স্বর্ণেন্দুর বন্ধু ঘনশ্যাম। শুনলাম, বংশীর অসুখ—

এস বাবা, এস। এখুনি তোমার কথা বলছিল স্বর্ণেন্দু।

রাত্রি কোন কথা না ব'লে কারও দিকে না চেয়ে ভেতরে চ'লে গেল। স্বর্ণেন্দুর মা খানিকক্ষণ স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে রইলেন আমার দিকে, তারপর বললেন, আমি স্বর্ণেন্দুর মা।

প্রণাম করলাম আমি।

হয়তো আমার সদ্য-লব্ধ জ্ঞানের ফলেই আমার দৃষ্টির তারতম্য ঘটল। প্রণামান্তে চোখ তুলে যখন চাইলাম, তখন মনে হ'ল, তাঁর মুখের তরুণী-ভাবটা যেন তিরোহিত হয়েছে। অন্তরালবর্তিনী বৃদ্ধাকে যেন দেখা যাচ্ছে। নিটোল মুখখানি যদিও জরালেশহীন (পদ্মপত্রে জলের দাগ পড়ে না, আকাশের

গায়ে মেঘের মলিনতা লেপটে থাকতে পায় না , তবু কিন্তু কোথায় যেন, খুব সম্ভবত চোখের দৃষ্টিতেই, তাঁর আসল বয়সের পরিচয় পেলাম। পরে এই মহিলার জীবন-রহস্যের যতটুকু আবিষ্কার করেছি, যদিও তার অধিকাংশই হয়তো আমার কল্পনা, কারণ মাত্র একখানা চিঠির টুকরো টুকরো কথা থেকে নিঃসংশয়ে কতটুকুই বা জানা যায়, ডি. কে.-র কথাই বা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তা কে জানে ! তা ছাড়া তার মুখ থেকে সব ঘটনাটা আমি শুনিও নি, রাখালবাবু পূর্ণেন্দুবাবু জ্যোতির্ময় নামে অন্য লোক থাকাও যুক্তির দিক দিয়ে অসম্ভব নয়—যাই হোক, যতটুকু আবিষ্কার করেছি ব'লে আমার বিশ্বাস, এবং যে বিশ্বাসের জোরে রাত্রির সমস্ত দুষ্কৃতি সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করা সম্ভবপর হয়েছিল আমার পক্ষে—সেদিন সে রহস্যের আভাস স্বর্ণেন্দুর মায়েব চোখে দেখেছিলাম যেন। সেই চির-পুরাতন চির-নূতন রহস্য, সর্বযুগের সর্বস্তরের নারীর দৃষ্টিতে যার কুণ্ঠিত বা অকুণ্ঠিত প্রকাশ সর্বযুগের সর্বস্তরের পৌরুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে নানা ভাবে।

এই সামনের ঘরটাতেই আছে স্বর্ণেন্দু, যাও, ভেতরে যাও তুমি।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে তিনি দোতলায় উঠে গেলেন। এমন নির্বিকারভাবে গেলেন, যেন এ বাড়ির তিনি কেউ নন, কিংবা যেন সমস্তই তাঁর এত জানা, এমন নখদর্পণে যে, এ সম্বন্ধে আর বিন্দুমাত্র কৌতূহল তাঁর অবশিষ্ট নেই, এমন কি এই সব কেন্দ্র ক'রে শিষ্টাচার করাও যেন তাঁর পক্ষে ক্লান্তিজনক।

দ্বার ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম।

ঢুকেই স্বর্ণেন্দুর বাবার মুখখানা চোখে পড়ল, আধখানা মরা আধখানা জীবন্ত মুখ। দ্বার খোলার শব্দে জীবন্ত চোখটা খুলে গেল, সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর আবার বুজে গেল চোখটা, নীরবে যেন তিনি বললেন, ও, বুঝেছি। ঘরে আর কেউ নেই। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। রকেটের মত ছুটে বেড়াতেন যিনি, যাঁর সুনীতি-দুর্নীতি পাপ-পুণ্যের আদর্শ এমন যে, তা বল্‌শেভিক রাশিয়াতেও চলবে কি না সন্দেহ, সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অসহায়-ভাবে বিছানায় প'ড়ে আছেন—নির্বাক, নিঃসঙ্গ, ছেলে মেয়ে স্ত্রী কেউ কাছে নেই। এ রকম করুণ দৃশ্য আমার ডাক্তারী জীবনে আরও দেখেছি। বাড়ির কর্তা হঠাৎ যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যা নেন, তখন তাঁকে ঘিরে কিছুকাল চিকিৎসার সমারোহ হয়, যার যেমন সঙ্গতি সেই অনুসারে। তারপর ক্রমশ সব থেমে যায়। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য দুর্ঘটনাটা সকলের গা-সওয়া হয়ে আসে, আত্মীয়-স্বজনের স্নায়ু-কেন্দ্রে উত্তেজনা সঞ্চার করবার মত তীব্রতা আর তাতে থাকে না। তখন অসহায় চলচ্ছক্তিহীন শয্যাশায়ী বৃদ্ধের সেবা করাটা ক্রমশ ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখানোর মত নিয়ম-রক্ষাগোছ কর্তব্যে পরিণত হয়। ঠাকুরের সঙ্গে শয্যাশায়ী কর্তার কিন্তু অনেক তফাত। সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখাতে বিলম্ব হ'লে মাটির ঠাকুর প্রতিবাদ করেন না, কিন্তু সেবার ত্রুটি ঘটলে (এবং অনেক

সময় সেবার ত্রুটি ঘটেছে কল্পনা ক'রে নিয়ে) পক্ষাঘাতগ্রস্ত কর্তা অসন্তুষ্ট হন এবং তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেবক-সেবিকারাও —হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলে মেয়েরাই—বিরক্ত হয়ে ওঠেন দেখেছি। কতদিন আর একটানা রাত্রি জাগা যায়, বার বার কতবার বিছানা বদলাতে পারে মানুষে,—হ'লই বা স্বামী, হ'লই বা বাবা—মানুষের, রক্তমাংসের মানুষের, সহ্যের সীমা আছে তো। পুত্রও তখন পিতাকে রূঢ়ভাষণ করে, সতী রমণীর মুখ দিয়েও যে বাক্য নির্গত হয়, তা রমণীয় নয়। আমার মনে একটা কথা জাগছিল, মধুপুর ছেড়ে কলকাতা শহরের এই এঁদো গলিতে চ'লে এলেন কেন এঁরা? পরে জেনেছি, আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। স্বর্ণেন্দু যখন তার মাকে মথুরা থেকে আনতে গিয়েছিল, তখন তাঁকে বলে নি যে, মধুপুরে জ্যোতির্ময়ের বাড়িতেই যাচ্ছে তারা; এবং তিনি পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে এত নির্বিকার ছিলেন যে, কৌতূহলও তেমন প্রকাশ করেন নি তখন, পূর্ণেন্দুবাবুর সম্বন্ধে সমস্ত কৌতূহলই যেন অবসান হয়ে গিয়েছিল তাঁর। স্বর্ণেন্দুর মা জানতেন, জ্যোতির্ময়ের বাড়িতে ভাড়াটে আছে এবং জ্যোতির্ময় মেতে আছে তার চিত্র-প্রদর্শনী নিয়ে কলকাতায়। ভেতরে ভেতরে যে এত কাণ্ড হয়েছে—জ্যোতির্ময় ভাড়াটেদের উঠিয়ে দিয়েছে, চিত্র-প্রদর্শনীর দরজায় তালা বন্ধ ক'রে দিয়ে ট্যাক্সি হাঁকিয়ে চ'লে এসেছে, এসব কিছুই জানতেন না তিনি। যেদিন জানতে পারলেন, সেই দিনই তিনি মথুরা থেকে চ'লে এলেন এবং এমন সব কাণ্ড করতে লাগলেন, এমন ঘন ঘন ভর হতে লাগল

তাঁর যে, স্বর্ণেন্দু বাধ্য হয়ে সবাইকে নিয়ে চ'লে এল কলকাতায়। আমার মনে হয়, স্বর্ণেন্দু যদি সমস্ত ব্যাপারটা মথুরাতেই মাকে খুলে বলত, এত কাণ্ড হ'ত না, অর্থাৎ জ্যোতির্ময় আর রাত্রি এতদিন একসঙ্গে থাকবার সুযোগ পেত না। এ কথা শোনামাত্র প্রবল আপত্তি করতেন তিনি, এবং তাঁর প্রবল আপত্তির বিরুদ্ধে স্বর্ণেন্দু, জ্যোতির্ময়, রাত্রি কেউ দাঁড়াতে পারত না। স্বর্ণেন্দু ভেবেছিল, মাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোন রকমে এনে ফেলতে পারলে হয়তো তিনি বুঝবেন সব, হয়তো তিনি রাত্রি আর জ্যোতির্ময়ের মেলামেশা দেখে বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না। কিন্তু ভুল ভেবেছিল স্বর্ণেন্দু, নিজের মাকে সে চিনত না। কজনই বা চেনে? গাছ কি মাটিকে ভাল ক'রে চেনে? মাটির সব দৈন্য-ঐশ্বর্যের খবর রাখে? সে শুধু মাটির রস চেনে, যা শোষণ ক'রে সে বড় হয়।

পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত-চোখটা আবার খুলে গেল। শুধু খুলে গেল নয়, ক্রমশ বড় হতে লাগল, মনে হ'ল, ছুটে এসে বুলেটের মত আঘাত করবে আমাকে এখুনি। যদিও মৃত চোখটা সঙ্গে সঙ্গে মিনতি করছিল, তবু আমি সামনের দেওয়ালে পরদা-ঢাকা যে দরজাটা ছিল, সেইটে দিয়ে দ্রুতপদে ঢুকে পড়লাম পাশের ঘরটাতে।

খুব লম্বা সরু গোছের ঘরটা, কমানো টেবিল-ল্যাম্পের মৃদু আলোকে ঈষৎ আলোকিত। ঘরের অপর প্রান্তে একটা খাটে বংশী শুয়ে ছিল, তার মাথার শিয়রে ব'সে ছিল স্বর্ণেন্দু।

তার গোঁফ-দাড়ি-সমাকীর্ণ আনত মুখখানাতে সস্নেহ সেবা-পরায়ণতা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। স্বল্পালোক সত্ত্বেও আমি তা লক্ষ্য করেছিলাম, আমার ভুল হয় নি। ভুল হয় নি ব'লেই প্রত্যক্ষদর্শী না হয়েও আমি জানি, স্বর্ণেন্দু নির্দোষ। আমি এগিয়ে যেতেই স্বর্ণেন্দু চোখ তুলে চাইলে, তারপর একটু হাসলে—ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার—তারপর বললে, আয়, ব'স্।

বসলাম।

কি হয়েছে বংশীর, কে দেখছে?

কোন ডাক্তার ডাকি নি এখনও। এসেই কম্প দিয়ে জ্বর এল, ভাবলাম, ম্যালেরিয়া, দু-এক দিনে সেরে যাবে, কিন্তু আজ বিকেল থেকে কেমন যেন—

কম্প দিয়ে জ্বর, নিশ্বাসের দ্রুত-গতি এবং প্রলাপ দেখে সন্দেহ হ'ল লোবার নিউমোনিয়া। বংশী বিড়বিড় ক'রে বকছিল, হঠাৎ জোরে জোরে ব'লে উঠল, তোমার বয়স কত, তা আমি জানতে চাই না, তোমার সম্বন্ধে ওসব কিছু জানতে চাই না আমি, আমি তোমাকে চাই। কোথায় রাতু, রাতু! আবার খানিকক্ষণ বিড়বিড় ক'রে কি খানিকটা ব'লে গেল। তারপর আবার জোরে,—হ্যাঁ, দিয়েছিলে, একদিন তো দিয়েছিলে, কেন দিয়েছিলে, কেন?—উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠতে গেল, স্বর্ণেন্দু শুইয়ে দিলে জোর ক'রে। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি, হঠাৎ চোখে পড়ল, অন্ধকারে রাত্রিও ব'সে আছে বিছানার

ওপাশটায় বংশীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। চোখে অদ্ভুত একটা হিংস্র দৃষ্টি ফুটে উঠেছে তার।

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইলাম তিনজনেই। বংশী কখনও বিড়বিড় ক'রে, কখনও জোরে জোরে প্রলাপ বকতে লাগল। ঠিক কতক্ষণ যে ব'সে ছিলাম, এসব শুনে ঠিক সেই সময়ে মনে কি কি ভাবোদয় হয়েছিল, তা এখন ভাল ক'রে মনে নেই। এর পরে যে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে তা এই—স্বর্ণেন্দু রাত্রিকে বলছিল, ভোরে জ্যোতির্ময়কে তুই কি স্টেশন থেকে আনতে যাবি? সে তো এ বাসা চেনে না।

যাব।

স্বর্ণেন্দু স্নেহভরে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল রাত্রির দিকে। শুধু স্নেহ নয়, একটা মুগ্ধ ভাবও যেন লক্ষ্য করেছিলাম তার চোখে। বিছুটির পূর্ণ-পুষ্পিত রূপটি হয়তো দেখেছিল সে তখন।

হঠাৎ বংশী ব'লে উঠল, ইজিপ্টে ভাই-বোনে বিয়ে হ'ত—

রাত্রির নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

বংশী প্রলাপ বকছে।

জ্যোতির্ময় কয়েক ঘণ্টা পরেই এসে পড়বে।

এর পর সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা যদিও এই অধ্যায়েরই বিষয়বস্তু, পর পর ঘটেছিল, সুতরাং একসঙ্গেই বর্ণনীয়, কিন্তু তাদের গুরুত্ব এত বেশি, এবং শুধু লেখক হিসাবেই নয়, ব্যক্তিগতভাবেও আমি এ কাহিনীর সঙ্গে এমন বিজড়িত যে, একটানা লিখে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় ব'সে আছি। সার্শির লাল নীল সবুজ বেগুনী নানা রঙের কাচের ভেতর দিয়ে একই সূর্যালোক নানা বর্ণে প্রতিফলিত হয়ে পড়েছে আমার খাতার ওপর। একই সূর্যালোক! সবিস্ময়ে এই কথাটাই ভাবতে ইচ্ছে করছে বার বার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন রাত্রে যা যা ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি পরবর্তী একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। সেই কারণে করতে চাই, যে কারণে মহাভারতের সম্ভব-পর্বে অলৌকিক-ধীশক্তি-সম্পন্ন, অযুত-নাগেন্দ্র-সদৃশ বলবান, সুবিদ্বান, মহাবীর্য, মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্রের জন্মান্ধ হবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হয়েছিলেন, মহাভারতকার বলেছেন, মায়ের দোষে। সত্যবতী যদিও পুত্রবধূ অম্বিকাকে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকতে বলেছিলেন—তোমার এক দেবর আছেন, আজ রাত্রে তিনি তোমার নিকট আসবেন, তুমি অপ্রমত্তা হয়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা ক'রো; কিন্তু অম্বিকা নিজেকে ঠিক রাখতে পারেন নি। দীপশিখার প্রদীপ্ত আলোকে কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু দেখে ভয়ে বিস্ময়ে চক্ষু দুটি নিমীলিত ক'রে ফেলেছিলেন। ফলে ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ হতে

হয়েছিল। অন্ধতা-প্রযুক্ত তিনি যা করেছিলেন, তার জন্মে দায়ী তাঁর মা—অম্বিকা।

সেদিন শেষরাত্রে জ্যোতির্ময়কে স্টেশন থেকে আনতে যাবার মুখে রাত্রি আমার বাসায় এসেছিল কয়েক মিনিটের জন্ম। স্টেথোস্‌কোপ প্রভৃতি নিয়ে রীতিমত চিকিৎসক-বেশে আমি দ্বিতীয় বার যখন বংশীর চিকিৎসা উপলক্ষ্যে সেখানে গিয়েছিলাম, তখন আমার ঠিকানা আর ফোন-নম্বর দিয়ে ব'লে এসেছিলাম, একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছি, প্রলাপটা যদি না কমে, খবর দিও। সেই ঠিকানার সহায়তায় রাত্রি এসেছিল ভোরবেলা।

মনে দুশ্চিন্তা ছিল, মোহ ছিল, পেটে ক্ষুধাও ছিল প্রচুর (কারণ রায় মশায়ের বাড়িতে খাওয়া হয় নি এবং সে কথাটা গোকুলকে অত রাত্রে বলবার সাহস হয় নি), তবু এসে শোওয়া মাত্র আমি অগাধে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শুধু তাই নয়, স্বপ্নও দেখেছিলাম একটা। যেন প্রকাণ্ড একটা দিগন্তবিস্তৃত জলাশয়, কিন্তু তাতে জল নেই, আছে খালি কাদা, কাদা যে আছে তা-ও দূর থেকে বোঝা যায় না ; মনে হয়, শক্ত জমি ; স্থানে স্থানে সবুজের আভাস আছে, কিন্তু তার ওপর দিয়ে চলতে গেলেই হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যায়। সেই নির্জলা জলাশয়ের ওপর দিয়ে আমি আর রাত্রি যেন চলেছি, বার বার হাঁটু পর্যন্ত পুঁতে যাচ্ছে। রাত্রি আমার ওপর ভর দিয়ে পঙ্ককুণ্ড থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছে, কিন্তু তার দৃষ্টি আমার দিকে নেই, নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে আছে শূন্য দিগন্তের পানে।

হঠাৎ কড়কড় ক'রে দুয়ারের কড়াটা ন'ড়ে উঠতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম আমি। নেবে গেলাম। কপাট খুলেই দেখি, রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একটা সুটকেস। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল সে, আমিও চেয়ে রইলাম।

বংশী কি এখনও প্রলাপ বকছে?

থেমে গেছে।

অতি সাধারণ ব্রোমাইডে এত তাড়াতাড়ি এমন ফল পাওয়া যাবে, তা যদিও আমি প্রত্যাশা করি নি, তবু আত্মপ্রসাদে সমস্ত চিত্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

আপনি কি জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে হাওড়া যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। এই সুটকেসটা আপনার এখানে রেখে যেতে চাই। আপনার কি কোন অসুবিধে হবে?

না, কিছুমাত্র না।

একটা সুটকেস হাতে ক'রে জ্যোতির্ময়বাবুকে আনতে যাবার হেতু কি এবং হেতু থাকলেও মধ্যপথে সে সুটকেস আমার বাসায় রেখে যাওয়ারই বা কি প্রয়োজন, এই সব অতিশয় সঙ্গত প্রশ্ন আমার মনে জাগে নি তখন। আমি সেদিন স্বপ্নের ঘোরে ছিলাম, বাস্তব জগতের সঙ্গতি-অসঙ্গতির কোন অর্থ ছিল না আমার কাছে। এখন জেনেছি, পাছে পুলিসের হাতে চিঠিখানা পড়ে, এই ভয়েই সে সুটকেসে চিঠিখানা ভ'রে নিয়ে এসেছিল, তারপর মাঝরাস্তায় তার মনে হয়েছিল, জ্যোতির্ময় যদি চিঠিখানা দেখে ফেলে! চিঠিখানা সে নষ্ট ক'রে ফেলে নি

কেন, তা এখনও আমি ভেবে পাই না। বোধ হয় চিঠিখানা রেখেছিল নিজের ধর্মপরায়ণা মায়ের বিরুদ্ধে অকাট্য দলিল-স্বরূপ, অবশ্য এসব আমার কল্পনা।

রাত্রি চ'লে গেল। স্টেশন থেকে জ্যোতির্ময়কে নিয়ে আর ফেরে নি সে। সবিতার সঙ্গে জ্যোতির্ময়ের দেখা হবার সুযোগই সে দেয় নি। ফিরেছিল মাস চারেক পরে। জ্যোতির্ময় সঙ্গে ছিল না, সঙ্গে ছিল অবনীশ। অবনীশও বেশিক্ষণ থাকে নি, রাত্রিকে রেখে সে পরের ট্রেনেই ফিরে গিয়েছিল বম্বেতে। ব্যবসায়ী লোক সে, নষ্ট করবার মত সময় তার হাতে ছিল না।

যে সুটকেস রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল···হঠাৎ জ্যোতির্ময়ের মুখটা মনের মধ্যে জেগে উঠছে আমার। আচ্ছা, কেন এমন হয় বলতে পারেন, একটা কথা ভাবতে ভাবতে অতর্কিতে আর একটা কথা মনের মধ্যে জেগে ওঠে, একটা ছবিকে আড়াল ক'বে আর একটি ছবি নিজেকে জাহির করতে চায়? জ্যোতির্ময়কে আমি দেখি নি কখনও, কিন্তু তাব কথা শুনেছি অনেক। যখনই আমি তাকে কল্পনা করি, তখনই দেখি, সে যেন খুব দামী বিরাট একখানা মোটর 'ফুল স্পীডে' হাঁকিয়ে চলেছে। প্রকাণ্ড ভারা ফরসা মুখে টানা টানা চোখ, কালো সরু লম্বা একটা সিগারেট-হোল্ডার মুখের এক কোণে কামড়ে ধ'রে আছে, হু-হু শব্দে হাওয়া বইছে, হু-হু শব্দে মোটর ছুটে চলেছে, মাথার বিস্রস্ত চুলগুলো উড়ছে, স্টিয়ারিং ধ'রে সামনের দিকে চেয়ে ব'সে আছে জ্যোতির্ময়। সে আশপাশের কাউকে

দেখছে না, গাড়ির ভালমন্দর দিকেও তার লক্ষ্য নেই, পাশে কে ব'সে আছে তাও তার খেয়াল নেই—সে ফুল স্পীডে খালি ছুটে চলেছে।

সেদিন যে স্যুটকেসটা রাত্রি আমার কাছে রেখে গেল, তা আমি প্রায় তিন মাস পরে খুলেছিলাম, মানে—খুলতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাতে রাত্রিরই দু-একখানা কাপড় শেমিজ ব্লাউজ ছিল, আর ছিল একখানা চিঠি। রাত্রির মায়ের চিঠি, পূর্ণেন্দু-বাবুকে লেখা। সেদিন রাত্রে কি ঘটেছিল, তা বলবার আগে আমি চিঠিখানার কথা বলতে চাই। অবশ্য চিঠিখানা যে পূর্ণেন্দুবাবুকেই লেখা, চিঠিতে তার কোন প্রমাণ নেই, চিঠিতে 'শ্রীচরণেষু' ছাড়া অন্য কোন সম্বোধনই ছিল না। তবু কিন্তু চিঠির ধরন-ধারণ, তাতে ফার্নান্‌ডিজের উল্লেখ, অনুতাপমিশ্রিত একটা ক্ষুব্ধ আকূতি, আমার পরবর্তী অভিজ্ঞতা, সব মিলিয়ে এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি—অবশ্য কল্পনায়—যে, চিঠিখানা পূর্ণেন্দুবাবুকেই রাত্রির মা লিখেছিলেন। আদালতে হয়তো এ কথা প্রমাণ করতে পারব না, কিন্তু আমার অন্তর্যামী এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

আমার গোকুলচন্দ্র ছুটি না নিলে এ আবিষ্কার সম্ভবপর হ'ত না। শুধু তাই নয়, গোকুল যদি নীলুর চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধিমান আর কাউকে দিয়ে যেত, তা হ'লেও হয়তো হ'ত না। তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান যে কারণে এই 'পরিস্থিতি'র উদ্ভব হয়েছিল, সেটা হচ্ছে গয়াতে হঠাৎ আমার বাল্যবন্ধু ডি. কে.-র সঙ্গে

সাক্ষাৎকার। অদ্ভুত রকম যোগাযোগ সেটা। আমার কলকাতারই এক বড়লোক মক্কেল গয়ায় গিয়েছিলেন পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করতে। গয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং গয়ার চিকিৎসকদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না পেরে (অদ্ভুত জিনিস এই আস্থা।) আমাকে টেলিগ্রাম করলেন। আমি এলাম, চিকিৎসা করলাম, নিজের জীবনীশক্তির জোরেই বোধ হয় তিনি সেরে উঠলেন। আমি কিছু সুনাম এবং অর্থ নিয়ে সানন্দে ফিরে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ রাস্তায় ব্যায়ামবীর ধীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে দেখা। ধীরেনের সঙ্গে ইতিপূর্বে আমার আরও দু-একবার দেখা হয়েছিল, মাঝে মাঝে সে দু-একবার আমার বাসায় এসেছে গেছে, সুতরাং এক নজরেই দুজনে পরস্পরকে চিনতে পারলাম। সাধারণ কাপড়-জামা প'রে থাকলে ধীরেনকে ব্যায়ামবীর ব'লে চেনবার যেমন উপায় নেই, তাব নেপালী-ধরনের শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখমণ্ডলের মৃদু হাসি দেখেও তেমনই বোঝবার উপায় নেই যে, ছোকরা ভীষণ রকম একগুঁয়ে। মাথায় একবার একটা ধারণা ব'সে গেলে আর নড়তে চায় না। গয়াব ধূলিধূসর রাস্তায় আমাকে দেখতে পেয়ে ডি. কে. থমকে খানিকক্ষণ দাঁড়াল, ক্ষণকাল কি চিন্তা করলে এবং পরমুহূর্তেই উল্লসিত হয়ে উঠল—আমার অপ্রত্যাশিত দর্শন লাভ ক'রে নয়, অন্য কারণে। গয়ায় আমার আগমনের কারণ খুলে বলতেই, 'অদ্ভুত যোগাযোগ তো' এই কথা কটি উচ্চারণ ক'রে ডি. কে. আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে পড়বার উপক্রম করলে। অর্থাৎ

সে সঙ্গে সঙ্গে কৃতনিশ্চয় হয়ে গেল যে, আমি নির্ঘাত ওর সঙ্গে তাজমহল দেখতে আগ্রা যাচ্ছি, আকস্মিক যোগাযোগটাই ওর বিস্ময় এবং আনন্দ উদ্রেক করছিল। আমি যে ওর সঙ্গে যাবই,—অর্থাৎ নিজের শক্তি সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। 'খপ্পর' নামক ছোট্ট কথাটি যে কত প্রবল এবং কিরূপ জটিলতা-বোধক, ধীরেনের খপ্পরে না পড়লে তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শিকারের গায়ে এক পাক কোনক্রমে জড়াতে পারলে পাইথন যেমন শিকার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়, আমার নাগাল পাওয়া মাত্র ধীরেনও তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, যাক, একজন বাঙালী সঙ্গী পাওয়া গেল। বাঙালী সঙ্গী না হ'লে যে ওর ভ্রমণ আটকে ছিল তা নয়; কিন্তু ধীরেনের ওই স্বভাব,—একটা ধারণা মাথায় একবার প্রবেশ করলে সহজে বেরুতে চায় না। সাধারণত বাঙালীরা যেমন ফোটো তোলায় একবার বিয়ের সময় আর একবার মৃত্যুর পর, তেমনই ভ্রমণও করে—হয় চাকরি কিংবা ব্যবসায় ব্যপদেশে, অথবা ধর্মকামনায় বৃদ্ধবয়সে, যদি সঙ্গতি থাকে। শুধু শুধু তাজমহল দেখতে পয়সা খরচ ক'রে আগ্রা যাব, এ চিন্তাও বাঙালী-সন্তানের কাছে হাস্যকর। সত্য মিথ্যা নানা ওজুহাত দেখিয়ে আপত্তি করলাম। কিন্তু ডি. কে.-র মাথায় ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছিল, তা ছাড়া সে ভাল ক'রে জানত, কি করলে বাঙালী-সন্তান কাবু হয়। কিছু না ব'লে সে এগিয়ে এল এবং আমার গলাটি জড়িয়ে আমার টিকিট এবং সদ্য-লব্ধ 'চেক' সমেত 'মনিব্যাগ'টি বুক-পকেট থেকে

বার ক'রে নিয়ে নিজের পকেটে পুরে ফেলে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। ডি. কে. পালোয়ান লোক, কপাল দিয়ে লোহার ডাণ্ডা বেঁকাতে পারে, বুকের ওপর মোটরকার চড়ায়, তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করতে যাওয়া বৃথা। সকাতরে বললাম, আমি প্রায় এক কাপড়ে চ'লে এসেছি ভাই, যদি নিতান্তই যেতে হয়, কলকাতা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসি তা হ'লে।

ডি. কে. আর একবার মৃদু হেসে চাইলে আমার দিকে।

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দুজনে খানিকক্ষণ।

পোস্ট-অফিসের সামনে এসে ধীরেন বললে, দাঁড়াও একটু।

দাঁড়িয়ে রইলাম, পালাবার উপায় নেই, ব্যাগ ওর কাছে। মিনিট দশেক পরে পোস্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে এসে বললে, চল।

কোথায়?

ধর্মশালায়, ওইখানেই উঠেছি আমি।

ধীরেনকে ভ্রমণের নেশায় পেয়েছিল। বললে, দু মাস ধ'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ধর্মশালায় পৌঁছে বললে, তোকে আগ্রা থেকেই ছেড়ে দেব। আমার কেদার-বদরি পর্যন্ত ধাওয়া করবার ইচ্ছে আছে। একা একা ভাল লাগছিল না, এমন সময় তোর সঙ্গে দেখা।

আমার যে কাপড়-চোপড় কিচ্ছু সঙ্গে নেই।

রাত এগারোটা নাগাদ সব এসে পড়বে। আমার চেনা-শোনা একটি লোক আসছে আজ, তাকেই টেলিগ্রাম করলাম তোর বাসা থেকে তোর কাপড়-চোপড় নিয়ে আসতে।

ঘাবড়াচ্ছিস কেন, না এসে পড়ে, কিনে নিলেই হবে। আমি দাম দেব।

পাইথনের হাত থেকে নিস্তার পেলাম না।

আমার বাসায় গোকুল ছিল না, নীলু ছিল। গোকুল থাকলে আমার নাম-লেখা কালো তোরঙ্গটা এসে পড়ত, কিন্তু নীলু থাকাতে এসে পড়ল সেই সুটকেসটা, যা একদা তিন মাস আগে রাত্রি রেখে গিয়েছিল আমার কাছে প্রদোষের গোপনতায়।

২

ধীরেনকে মিছে কথা বলেছিলাম। একেবারে যে আমার কাছে কাপড়-চোপড় ছিল না তা নয়, অল্পসল্প ছিল। আগ্রার ধূলোয় দুদিনেই সেসব ময়লা হয়ে গেল। ধীরেনের সেদিন যাবার কথা, ট্রেনের বেশি দেরি ছিল না। নিজের জিনিসপত্র গোছাচ্ছিল সে। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে হঠাৎ সে বললে, আচ্ছা, তুই এ সুটকেসটা আনালি, অথচ একদিনও খুললি না কেন বুঝতে পারছি না!

ওর চাবি আমার কাছে নেই।

চাবি নেই ব'লে ময়লা কাপড়-জামা প'রে ঘুরবি!

ঘরের কোণে সুটকেসটা ছিল, ডি. কে. উবু হয়ে গিয়ে বসল তার সামনে এবং আমি কিছু বলবার আগেই তালাটা ধ'রে

এমন একটা মোচড় দিলে যে, সবসুদ্ধ উপড়ে উঠে এল। অপর কেউ হ'লে বাক্সের ডালাটা তুলে দেখত এর পর, কিন্তু ডি. কে.-র তা স্বভাব নয়। সে স্থানচ্যুত কলসুদ্ধ তালাটা মেঝেতে রেখে আমার দিকে একবার চাইলে এবং তারপর বেসুরে একটা গান গুনগুন করতে করতে আবার নিজের জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। সেই দিনই ও মথুরা হয়ে হরিদ্বার যাচ্ছিল, সেখান থেকে হৃষিকেশ-কনখল সেরে লছমনঝোলা যাবে। লছমনঝোলা থেকে কেদার-বদরি। ও তখন মনে মনে মশগুল হয়ে ছিল, একটা ছোট সুটকেসের ভেতর কি আছে তা দেখবার কৌতূহলই হ'ল না ওর। তালা ভাঙা সত্ত্বেও আমিও যে তখুনি উঠে বাক্সটা খুললাম না, সেটাও ওর নজরে পড়ল না। ওর স্বভাবই ওই রকম। একটু পরেই টাঙা ডেকে আমি স্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এলুম ধীরেনকে। ধীরেন ব'লে গেল, কেদার-বদরি থেকে যদি ফিরতে পারে, তা হ'লে আবার কলকাতায় দেখা করবে এসে। আমি আগ্রায় আরও দু-একদিন থেকে গেলাম, কাছাকাছি আরও দু-একটা দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে যাবার লোভ হ'ল।

এই সূত্রে এক সিগারেট-খোর সায়েবের গল্প মনে পড়ছে, এবং তার সঙ্গে নিজের আচরণের তুলনা ক'রে মনে যে অনুভূতি জাগছে, চলতি ভাষায় তাকে লজ্জাই বলতে হয়; কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, আমরা নির্লজ্জ। এক ডাকবাংলোয় এক সিগারেট-খোর সায়েবের দেশলাই ফুরিয়ে গিয়েছিল। কাছাকাছি সব দোকানে খোঁজ করলেন, কিন্তু 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই

পাওয়া গেল না, সব 'মেড ইন জাপান'। দু ক্রোশের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের তৈরি দেশলাই পাওয়াই গেল না। সন্ধ্যাবেলা স্টীমার এল, তাতে 'মেড ইন ইংল্যাণ্ড' দেশলাই পাওয়া গেল, তারপর সায়েব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত দিন তিনি সিগারেট খান নি।

আমাদের আদর্শনিষ্ঠা অতিশয় ঠুনকো। সামান্য একটু চাপ পড়লেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ডি. কে. চ'লে যাবার পর রাত্রির স্যুটকেস খুলে দেখেছিলাম। তাতে দু-একখানা শাড়ি-ব্লাউজ ছাড়া একখানা চিঠি ছিল। কারও চিঠি তার বিনা-অনুমতিতে পড়া যে অনুচিত, এ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও চিঠিখানা পড়েছিলাম আমি। পূর্ণেন্দুবাবুকে লেখা রাত্রির মায়ের চিঠি।

৩

তার পরদিন ঠিক সূর্যোদয়ের পূর্বে তাজমহলের একটা মিনারেটের ওপর একা ব'সে ছিলাম। গ্রীষ্মকাল। দেখছিলাম, প্রায়-নির্জলা যমুনা পূর্বমহিমার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে কোনক্রমে। কল্পনা করবার চেষ্টা করছিলাম, আলমগীর-কল্পিত কালো তাজমহল যদি যমুনার ওপারে সত্যিই নির্মিত হ'ত, কেমন দেখতে হ'ত সেটা, তাজমহলের অভ্যন্তরে বৃদ্ধ পরিচারকের মুখনিঃসৃত 'আল্লা' শব্দটার করুণ প্রতিধ্বনি আবার যেন শুনতে পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল আগ্রা ফোর্টের সেই অংশটা, যেখানে শাহ্জাহান এসে বসতেন,—দেওয়ালের গায়ে সারি সারি সবুজ

গোল পাথর আর তার প্রত্যেকটিতে তাজমহলের সম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি।...সহসা সমস্ত অবলুপ্ত ক'রে মনে পড়ল চিঠিখানার কথা। চিঠিখানা পকেটেই ছিল, আবার খুলে পড়লাম, বার বার ক'রে সেই অংশটাই পড়লাম, যার অর্থ বুঝতে পেরেও বুঝতে না পারার ভান করছিলাম।—

"তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার অনুমতি না নিয়ে কেবলমাত্র ফার্নান্‌ডিজকে সঙ্গে ক'রে আমি শিবসমুদ্রম্‌ দেখতে কেন গিয়েছিলাম, সেখানে কেনই বা আমার দু দিন দেরি হ'ল, এসবের জবাবদিহি তোমার কাছে দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জান। জেনেশুনেও তুমি তবু জবাবদিহি তলব করেছ, কারণ তুমি পুরুষ, উচ্ছ্বাসের মুখে যেসব প্রতিশ্রুতি দাও, উচ্ছ্বাস ক'মে গেলে তা পালন করবার কষ্ট স্বীকার করতে চাও না। এখন তুমি অনায়াসে ভুলে গেছ যে, শান্তনুর মত তুমিও একদিন আমার কাছে গদগদ ভাষায় প্রতিজ্ঞা করেছিলে, আমার কোন আচরণের প্রতিবাদ তুমি করবে না। অথচ আজ তুমি কড়া ভাষায় জবাবদিহি চেয়েছ। ন্যায়ত ধর্ম্মত যাঁর জবাবদিহি দাবি করবার অধিকার, তিনি ভুলেও কখনও তা করেন নি, করবেনও না। তুমি কি জান না, তুমিই এর মূর্তিমান জবাবদিহি!..."

এ কটি কথার মধ্যে যে নিগূঢ় সত্য প্রচ্ছন্ন আছে, তা স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করবার সাহস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। রাত্রির অন্ধকারে গাছকে ভূত এবং মেঘকে পর্বত ব'লে ভুল করা

অসম্ভব নয়। তবু আমি জানি, আমি ভুল করি নি। রাত্রিকে এ বিষয়ে কোনদিন—হ্যাঁ, অধিকার পেয়েও—প্রশ্ন করি নি। স্যুটকেসটি নিখুঁতভাবে সারিয়ে নিরুৎসুকভাবেই ফেরত দিয়েছিলাম।

বেশ মনে পড়ছে, চিঠিখানা পড়বার পর আবার আমার কল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল যমুনার অপর পারে কালো তাজমহলের নিকষকৃষ্ণ নিবিড় কান্তি,—তার কোথাও একবিন্দু সাদা নেই, আগাগোড়া সমস্ত কালো।

তারপর সহসা অনুভব করলাম, আমি শুভ্র তাজমহলের সু-উচ্চ মিনারেটে ব'সে সূর্যোদয় দেখছি—কালো তাজমহলটা নিছক কল্পনামাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

সেদিন ভোরে স্যুটকেসটা আমার কাছে রেখে রাত্রি যখন চ'লে গেল, আমি খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম চুপ ক'রে। রাত্রির অপ্রত্যাশিত অভ্যাগম ও অন্তর্ধান, তিন খোরাক ব্রোমাইড মিকশ্চারের কার্যকরী শক্তি এবং তজ্জন্য নিজের ঈষৎ গর্ব, আমার বৈঠকখানা-ঘরের নতুন-কেনা নীল-ডোম-দেওয়া ইলেকট্রিক বাতির নীলাভ আলো, কয়েকটা কলের সমবেত বংশীধ্বনি—সমস্তটা মিলিয়ে সেটা যেন একটা নূতন রকম ভোর।

এই গলিতে যতদিন থেকে বাস করছি, ততদিন ভোরের সঙ্গে যে কটা জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ব'লে আমার ধারণা, সেদিন ভোরে এক ওই কলের বাঁশী ছাড়া, কি ক'রে জানি না, বাকি কটা জিনিস বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রোজ হুড়হুড় শব্দ ক'রে ময়লা-ফেলা গাড়ি যায়, কড়কড় শব্দ ক'রে পাশের বাড়ির ঝি এসে কড়া নাড়ে, ঘড়ঘড় শব্দে গলার কফ তুলতে তুলতে সামনের বাড়ির দ্বারিকবাবু তামাক খান, বড়বড় ক'রে মন্ত্র পড়তে পড়তে একদল লোক গঙ্গাস্নান করতে যায়, ছড়ছড় ক'রে কলে জল আসে। সেদিন ভোরেও এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার প্রত্যক্ষ চেতনায় দাগ কাটতে পারে নি। সেদিনকার ভোরটা গগন ঠাকুরের ছবির মত একটা বিশিষ্ট অপরূপতায় আঁকা আছে আমার মানসপটে এখনও। নীলাভ আলোতে রাত্রি এসে দাঁড়াল, বংশীর প্রলাপ থেমে গেছে শুনে আমার মন আত্মপ্রসাদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, রাত্রির স্থির দৃষ্টিতে প্রত্যাশিত প্রশংসার আভাস মাত্র না দেখে একটু ক্ষোভ জাগল, সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে রাত্রির গভীর প্রকৃতির পরিচায়ক মনে হওয়াতে সান্ত্বনা এল, নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে কলের বাঁশীগুলো বেজে উঠল, রাত্রি চ'লে গেল।

'বেশ মনে পড়ছে, আমার মনে হয়েছিল যে, কলকাতা শহরে মাটি, আকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রের কোন অর্থ নেই, যেখানে ফুলের স্থান গাছে নয়—বাজারে, যেখানে পাখি নীড় বাঁধে না—খাঁচায় থাকে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে সকলেই

যেখানে নেশার ঘোরে উন্মত্ত, সুস্থ মনোবৃত্তি যেখানে উপহাসের খোরাক, নারীর নারীত্ব, কবির কবিত্ব, মানুষের মনুষ্যত্ব যেখানে পণ্যদ্রব্যের সামিল, যেখানে ট্রামে, বাসে, সিনেমায়, বড় রাস্তায়, গলিতে সর্বত্রই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মৃতপ্রায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতার নিস্তেজ আক্ষেপকে আনন্দ ব'লে মনে ক'রে কৃত্রিম উল্লাসের ভান করছে, সেই কলকাতা শহরের বুকে। এমন একটা ভোর সম্ভব হ'ল কি ক'রে! বিস্ময় জেগেছিল মনে, একটা স্বপ্নসুলভ আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি, সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছিলাম যে, বর্তমান যুগের উন্মাদ জনতার আমিও একজন, যে আনন্দে অভিভূত হয়েছি তা বর্তমান-যুগ-সুলভ স্বাপ্নিক আনন্দই, বলিষ্ঠ কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ যখন নিজেকে আবিষ্কার করলাম, তখন দেখলাম, সেই নীলাভ আলোতে একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে তন্ময় হয়ে 'লোবার নিউমোনিয়া' সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করছি। আমার সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত অভিজ্ঞতা, সমস্ত বিদ্যা একাগ্র হয়ে উঠেছে—বংশীকে বাঁচাতে হবে। হোক রাত্রির প্রকৃতি সুগভীর, বংশীকে যদি সত্যি সত্যি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, এতটুকু কৃতজ্ঞতার ঢেউ কি জাগবে না তার রহস্যময় অন্তর-সমুদ্রে, নিষ্পলক চোখের দৃষ্টিতে সামান্যতম কোমলতাও কি আভাসিত হবে না? ...কতক্ষণ পড়েছিলাম মনে নেই, আরও অনেকক্ষণ হয়তো পড়তাম, যদি না একটা তীব্র অনুভূতির তাড়নায় উঠে বসতে হ'ত। ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। সমস্ত রাত খাওয়া হয় নি।

সহসা-পুঞ্জীভূত বিরক্তিসহকারে ডাক্তারী বইগুলো সরিয়ে ফেলে অনাবশ্যকরকম উচ্চকণ্ঠে ডাকলাম গোকুলকে, আলোটা নিবিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। খোলা দরজা দিয়ে কুণ্ঠিত ভোরের আলো ঘরে প্রবেশ করল, ইলেক্‌ট্রিক আলোর ভয়ে সে যেন এতক্ষণ বাইরে সসঙ্কোচে দাঁড়িয়ে ছিল।

আদেশ শুনে গোকুল খুশি হ'ল, মনে মনে একটু বিস্মিতও হ'ল বোধ হয়। 'ভয়ানক খিদে পেয়েছে' ব'লে খাবার দাবি করছি, এর চেয়ে আনন্দজনক বিস্ময়কর ঘটনা গোকুলের জীবনে বেশি ঘটে না। ওকে প্রত্যহ অনুযোগ, মিনতি, বকুনি, অভিমান—নানা উপায় অবলম্বন করতে হয় আমাকে পেট ভ'রে খাওয়াবার জন্যে। ওর ধারণা, ছোট ছেলেরা যেমন মাকে ফাঁকি দিয়ে নানা ছুতোয় খায় না, আমিও তেমনই নানা ছুতোয় গোকুলকে ফাঁকি দিই। মহানন্দে গোকুল একটা বড় পাঁউরুটি কাটতে ব'সে গেল, একটু পরে শব্দ শুনে বুঝলাম, ডিমও ফ্যানাচ্ছে—গোকুল জানে আমি কি ভালবাসি, ও পুরুষমানুষ নয়, ও মা।

এখন আমার মনে হচ্ছে, সেদিন এই দেরিটা যদি না হ'ত অর্থাৎ রাত্রির আসা, সুটকেস রাখা, চ'লে যাওয়া—এই সামান্য ঘটনা যদি আমাকে সেদিন অতটা স্বপ্নাচ্ছন্ন না করত, বড় বড় ডাক্তারী বই ঘেঁটে অতখানি সময় যদি আমি অনর্থক নষ্ট না করতাম, অমন অসময়ে যদি অত খিদে আমার না পেত, রায় মশায়ের বাড়িতে রাত্রির সঙ্গে দেখা হওয়ার পূর্বেই যদি আহারটা সমাধা করতে পারতাম—অর্থাৎ অনিবার্যভাবে যে যে ঘটনা

ঘটাতে স্বর্ণেন্দুর ওখানে যেতে আমার দেরি হয়ে গেল, সেগুলো যদি না ঘটত, তা হ'লে হয়তো জিনিসটা অন্য রকম হতে পারত। দেরি হ'ল ব'লেই প্রাতভ্রমণ-ফিরতি ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখ হয়ে গেল, তিনি গল্পের অবতারণা ক'রে আরও দেরি করিয়ে তো দিলেনই, আমার মুখে সমস্ত শুনে পূর্ববন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে আমার সঙ্গে যেতে চাইলেন এবং নিজের চোখে সমস্ত দেখে আইনের মর্যাদা রক্ষা করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হলেন।

আমি স্নান সেরে যখন চুল আঁচড়াচ্ছি, এমন সময়ে দ্বারের কাছে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রঙ-চটা গাঁট-গাঁট লাঠিটি বগলে ক'রে ঈষৎ ঝুঁকে রুমালের ঝাপটা দিয়ে প্যানেলা জুতো থেকে ধুলো ঝাড়ছেন ধরণীবাবু। আমাকে দেখে ঈষৎ হাসলেন, তারপর যেন আমার একটা জুয়াচুরি ধ'রে ফেলেছেন এই ভাবে প্রশ্ন করলেন, এর মধ্যেই চা তৈরি যে দেখছি আজ, ব্রাহ্মণকে সকালবেলায় চা খাইয়ে পুণ্য-সঞ্চয় করবার মতলব নাকি হে ?

বললাম, আসুন, বসুন।

খুটখুট ক'রে প্রবেশ করলেন ধরণীবাবু।

২

যদিও আমি খুব অন্যমনস্ক ছিলাম, অর্থাৎ আমার মনের যে অংশটা ধরণীবাবুর সঙ্গে লৌকিকতা করতে ব্যস্ত ছিল, তার চেয়ে ঢের বড় একটা অংশ যদিও নীরব নেপথ্যে ব্যস্ত ছিল রাত্রিকে

নিয়ে, তবু ধরণীবাবুর একটা কথা কানে প্রবেশ করামাত্রই রাত্রিকে নিয়ে ব্যস্ত মনের বৃহৎ অংশটার অধিকাংশই যেন সহসা বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে এসে যোগদান করলে ধরণীবাবুর অংশটায়। এক চুমুক চা পান ক'রে ভারি একটা হৃদয়রোচক প্রসঙ্গ তুললেন ধরণীবাবু।

শুধু ধরণীবাবুই নয়, আমাদের অনেকেরই জীবনদর্শন এবং জীবনযাপন এই দুইয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। সত্য অথবা মিথ্যা দার্শনিকতার পাখায় ভর ক'রে মনোলোকের যে আকাশে আমরা অহরহ উড্ডীয়মান হই, সত্যি সত্যি উড়তে গিয়ে দেখা যায়, সে আকাশ-বিলাস বাস্তব-জগতে আমাদের পক্ষে অসম্ভব, কারণ আমাদের পাখা এবং আকাশ দুইই কাল্পনিক, আসলে একটা পঙ্ককুণ্ডে কৃমির মত কিলবিল করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কল্পনাবান কৃমির যা দুর্দশা, আমাদেরও সেই দুর্দশা। ধরণীবাবু সাহেবদের ওপর চটা, স্ত্রীশিক্ষার ওপর চটা, ব্রাহ্মদের ওপর চটা, সিনেমার ওপর চটা, টর্চের ওপর চটা, ট্যাক্সির ওপর চটা, আধুনিক অনেক জিনিসেরই ওপর হাড়ে-চটা তিনি। তাঁর মন কল্পনার পাখায় ভর ক'রে যে যুগের আকাশে উড়ে বেড়ায়, সেটা—ধরণীবাবু যদিও বলেন বৈদিক যুগ—আসলে বোধ হয় শায়েস্তা খাঁর আমল। সে যুগে টাকায় আট মণ চাল ছিল, প্রচুর টাটকা দুধ ঘি মাছ সস্তায় পাওয়া যেত, স্ত্রীলোকদের আব্রু ছিল, এক-ব্যক্তিক নয়, একান্নবর্ত্তী পরিবারে লোকে সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘজীবী হয়ে গ্রামে বাস করত। এই

যুগের স্বপ্ন দেখতে দেখতে বাস্তব জীবনে কিন্তু ধরণীবাবুকে সাহেবদের ঝুঁকে সেলাম ক'রে তাদের অধীনে চাকরি করতে হয়েছে, শহরে এসে বাস করতে হয়েছে, একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন ছিন্ন করতে হয়েছে, নিজের ছোট মেয়েটিকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিতে হয়েছে, সিনেমা দেখতে হয়েছে, টর্চ কিনতে হয়েছে, গত যুগের ব্রাহ্মদের মহত্ত্ব স্বীকার করতে হয়েছে, ট্যাক্সি চড়তে হয়েছে, কলের চাল পচা মাছ জ'লো দুধ দুর্মূল্যে কিনতে হয়েছে, এবং আরও অনেক কিছু করতে হয়েছে, যা শায়েস্তা খাঁর আমলে কেউ করত না। এব ফলে যা হয়েছে, তাকে যদিও আমরা শুদ্ধ ভাষায় দার্শনিকের আকৃতি বলি না, চলিত ভাষায় কুৎসা-প্রবণতা নামে অভিহিত ক'রে থাকি ; কিন্তু এটা মনে বাখা উচিত যে, কয়লাই অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে হীরকে পরিণত হয়। আমার বিশ্বাস, অনুকূল 'পরিস্থিতি'তে পড়লে ধরণীবাবুর পরনিন্দাপ্রবণ মনোভাব দার্শনিক মনোবৃত্তিতে রূপান্তবিত হতে পারত, তিনি আর কিছু না হোন, জনপ্রিয় সম্পাদক হতে পাবতেন, সকালে বিকেলে অপরের বৈঠকখানায় হানা দিয়ে বর্তমান-যুগে-বাধ্য-হয়ে-বাস-কবা-জনিত দার্শনিক ক্ষোভ উদাহরণ-সম্বলিত ক'রে প্রকাশ ক'রে বেড়াতে হ'ত না তাঁকে, লোকে সভা ক'রে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে সভাপতি-রূপে এবং উৎকর্ণ হয়ে শুনত তাঁর দার্শনিক বাণী।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ধরণীবাবু বললেন, ওহে, মেঘনাদ এতদিন মেঘের আড়াল থেকে বাণ নিক্ষেপ করছিলেন, এইবার

সশরীরে দেখা দিয়েছেন। ইয়া পাকানো গোঁফ। মেঘনাদ-প্রসঙ্গ ধরণীবাবু ইতিপূর্বে আরও দু-একবার আলোচনা করেছেন, সুতরাং বুঝতে দেরি হ'ল না যে, তিনি সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির অদৃশ্য-অথচ-বর্তমান প্রণয়ীটির চাক্ষুষ দর্শন লাভ করেছেন, যে তরুণী শিক্ষয়িত্রীটি তাঁর বাড়ির সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন।

উৎসুক কণ্ঠে বললাম, তাই নাকি ?

কাপে দ্বিতীয় চুমুক দেবার জন্যে কাপটি তুলেছিলেন ধরণীবাবু, কিন্তু ওষ্ঠ পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে শূন্যেই সেটাকে ধ'রে রাখলেন এবং সস্মিত দৃষ্টিতে আমার পানে চেয়ে রইলেন।

তোমরা নাড়ী টিপে তবে লোকের ভেতরের খবর বলতে পার, তাও সব সময় পার না, কিন্তু আমরা এক নজরেই পারি।

দ্বিতীয় চুমুক দিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে সেই-জাতীয় আনন্দ ক্ষরিত হতে লাগল, যা কোন আবিষ্কারকের দৃষ্টি থেকে উপচে পড়া স্বাভাবিক আবিষ্কারের পর।

যখনই দেখলাম, ঘন ঘন সিডান-বডি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াচ্ছে আর জানলায় ঘন ঘন টর্চের আলো ফেলছে—

তৃতীয় চুমুক দিয়ে খানিকটা চা ডিশে ঢাললেন।

বাধ্য হয়েই, মানে ভদ্রতার খাতিরেই, বলতে হ'ল আমাকে, আজকালকার কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।

আমার এই উক্তিতে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে দার্শনিক বক্তৃতা করবার সুযোগ পেলেন তিনি। উত্তেজনাভরে ডিশে ঢেলে ঢেলে তাড়াতাড়ি চা-টা শেষ ক'রে মুখটা মুছে হাত ধুয়ে

বহুবারশ্রুত সেই হৃদয়গ্রাহী কথাগুলি বেশ তারিয়ে তারিয়ে বলতে লাগলেন, আমি স্মিতমুখে মাথা নাড়তে নাড়তে শুনতে লাগলাম। তারপর একটু পরেই আমার যা স্বভাব, বাইরে হুঁ হুঁ করতে করতে ভেতরে ভেতরে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। ভাবছিলাম ওই তরুণী শিক্ষয়িত্রীটির কথাই। ভাবছিলাম, ভাগ্যিস মহিলা কলকাতা শহরে চাকরি করেন! কলকাতা শহরের বিশাল জনসমুদ্রে এত অসংখ্য কুৎসা-বুদ্বুদ উঠছে এবং লয় পাচ্ছে যে, তা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার অবসর নেই কারও, তা ছাড়া এখানে কেউ কারও তোয়াক্কাই করে না। কিন্তু এই মহিলা যদি কোন মফস্বল শহরের ডোবায় গিয়ে বুদ্বুদ কাটতেন, সেখানে যদি ঘন ঘন সমাগত সিডান-বডি ট্যাক্সি এবং টর্চ দিয়ে আলো ফেলার সঙ্গে ইয়া-পাকানো গোঁফকে জড়িয়ে ফেলবার সুযোগ দিতেন সেখানকার ধরণীবাবুদের, তা হ'লে কি বিপর্যয় কাণ্ডই না ঘটত! মফস্বলের ছোট শহবে সকলেই সকলের হিতৈষী, সকলেই সকলের হাঁড়ির খবর রাখে। কতক-গুলো বেকার বুড়ো আর ছোঁড়া সকলের সব খবরেব জন্য সর্বদা উৎকর্ণ। মফস্বলের ইস্কুল-মাস্টারনীদের দেখেছি, তাদের কথা ভাবলে ভারি দুঃখ হয় আমার। শহরসুদ্ধ সবাই তাদের গার্জেন। তাদের স্বাধীনভাবে কোথাও যাবার উপায় নেই, কারও সঙ্গে হেসে কথা কইবার উপায় নেই, রাত নটার পর কোথাও থাকবার উপায় নেই, (যেন রাত্রি নটার আগে কোন কিছু দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব!) বেচারীদের কিছু করবার উপায়

নেই। বহু গার্জেন কটমট ক'রে সর্বদাই তাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করছেন, এবং তারাও লেখা-পড়া শিখে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে হাস্যকর নিয়মের বোরখা প'রে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে বন্দিনীর মত।

সহসা সচেতন হয়ে উঠলাম ধরণীবাবুর একটা কথায়।

আরে, ওই যে তোমার পূর্ণেন্দুবাবুর মেয়ে—ওইটুকু বয়সে ও না করেছে কি?

তখন আমি জানতাম না, পরে জেনেছি, এই ধরণীবাবুই তাকে প্রেমপত্র লিখেছিলেন একটা। হ্যাঁ, এই ধরণীবাবুই—তার পিতৃবন্ধু।

উঠে পড়লাম।

আমাকে একবার যেতে হবে ওদের বাড়িতে এখুনি। বংশীর খুব অসুখ।

ওঁরা এসেছেন নাকি এখানে?

হ্যাঁ।

বাত্রিও এসেছে?

এসেছে।

কবে?

কবে ঠিক জানি না।

জামাটা গায়ে দিয়ে হাতে যখন হাত-ঘড়িটা বাঁধছি, ধরণীবাবু বললেন, চল, আমিও দেখে আসি। হাজার হোক বন্ধুলোক।

আপত্তি করতে পারলাম না।

ধরণীবাবু সঙ্গী হলেন।

৩

সেদিন সকালের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার মনে আছে। বেরিয়েই হাত-ঘড়িটা দেখলাম, ছটা বেজে পনরো মিনিট। যে ঘটনা-পরম্পরার জন্যে অনিবার্যভাবে আমার দেরি হ'ল, সেগুলো না ঘটলে আমি অন্তত আরও ছু ঘণ্টা আগে যেতে পারতাম বংশীর কাছে এবং ধরণীবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ত না। আমার এখনও ধারণা, ব্যাপারটা যদি ধরণীবাবুর জ্ঞান-গোচর না হ'ত, তা হ'লে হয়তো এত তাড়াতাড়ি সব জানাজানি হয়ে যেত না, হয়তো অন্য রকমও হতে পারত। কারণ বাড়িতে কেউ ছিল না। যে ঠিকে ঝিটা ওরা বাহাল করেছিল এসেই, সেই ঝিটাও তখনও আসে নি। স্বর্ণেন্দুব মা-ও ও-বাসায় ছিলেন না, তিনি ছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের একটা বাড়িতে তাঁর গুরুদেবের কাছে। বস্তুত, পবে শুনেছিলাম, তিনি এ বাড়িতে এসে ওঠেনই নি। তিনি গুরুদেবকে নিয়ে মির্জাপুব স্ট্রীটের বাসায় উঠেছিলেন। রায় মশায়েব বাড়ি থেকে বাত্রির সঙ্গে এসে গত রাত্রে যখন তাঁকে আমি দেখেছিলাম, তাব একটু আগে তিনিও এদের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছিলেন। দেখা করতে আসাব উদ্দেশ্য, বংশী অথবা পূর্ণেন্দুবাবু নয়, জ্যোতির্ময় এবং রাত্রি। তিনি দেখতে এসেছিলেন, জ্যোতির্ময় এসেছে কি না। আমি চ'লে আসবার একটু পরেই তিনিও ফিরে গিয়েছিলেন মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁর গুরুদেবের কাছে।

ঘড়িটা থেকে চোখ তুলেই দেখতে পেলাম, ঘোর নীল লুঙ্গি পরা সেই রোগা ফরসা ছোকরাটিকে, যে রোজ রাস্তার ধারের জানলায় ছোট হাত-আয়নাটি রেখে তন্ময়চিত্তে মুখ-বিকৃতি সহকারে দাড়ি কামায়। সেদিনও সে তাই করছিল। জানলার নীচেই সরু ফুট্‌পাথে একটা কালো বেরাল দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দিকে পীতাভ সবুজ চোখ দুটো ক্ষণকাল নিবদ্ধ রেখে হঠাৎ সে ত্রস্ত হয়ে ঢুকে পড়ল পাশের গলিটায়। তার পরের বাড়ির কাকাতুয়াটা তারস্বরে চীৎকার করছিল সমস্ত পাড়াটা সচকিত ক'রে। রাস্তাটা যেখানে বেঁকেছে, সেই বাঁকের মুখে একটা কল আছে, সেই কলকে কেন্দ্র ক'রে কলতলার কাব্য-কলরব উঠছিল, দগ্ধ-কটাহ-মার্জন-নিরতা আঁটসাঁট-কাপড়-পরা একটি তরুণী পরিচারিকার নবোন্মেষিত যৌবনের ঈষন্মাদক আবহাওয়ায়; আর একটু দূরে একজন ফেরিওয়ালা এসে এ-পাড়ার সবজান্তা গোষ্ঠবাবুর অহমিকাকে তোয়াজ ক'রে কতক-গুলো দাগী আম বিক্রি করবার চেষ্টা করছিল তাঁর কাছে, বলছিল, আপনি হলেন সমঝদার লোক বাবু, তাই আপনার কাছেই আগে নিয়ে এলুম। বুলবুলভোগ আম এ কলকাতা শহরে কটা লোক চেনে, বলুন? এই আমগুলো দেখে ধরণীবাবুর ভদ্রতাজ্ঞান উদ্বুদ্ধ হ'ল সম্ভবত, বললেন, তোমার কাছে গণ্ডা আষ্টেক পয়সা হবে হে ডাক্তার? পকেট থেকে ব্যাগ বার ক'রে দেখলাম, কাল রাত্রে ট্যাক্সি-ভাড়া দেওয়ার পর পাঁচ টাকা থেকে যা অবশিষ্ট ছিল তাই রয়েছে। ড্রাইভারকে আমি পাঁচ টাকার নোটটা

দিয়েছিলাম, সে কত ফেরত দিয়েছিল তা গুনে নেবার মত মনের অবস্থা ছিল না তখন আমার। দেখলাম, একটা আধুলি রয়েছে, বার ক'রে দিলাম ধরণীবাবুকে। ধরণীবাবু বললেন, ও নিয়ে আমি কি করব, কিছু কমলানেবু-টেবু কিনিগে চল। রুগীর বাড়ি যাচ্ছি, তা বললে কি চলে, হাজার হোক বন্ধুলোক, লোকত ধর্মত একটা—। ধরণীবাবু কথা অসম্পূর্ণ রেখে এমন ভাবে আমার পানে চাইলেন, যেন আমি কমলালেবু কেনার বিরোধী। আমি কিছু না ব'লে তাঁর অনুসরণ করতে লাগলাম। মোড়ের চায়ের দোকানটায় দেখলাম, বাঁধা খদ্দেরগুলি যুদ্ধের সংবাদ আলোচনা করতে করতে বহুবার-মোছা অয়েলক্লথ-মোড়া টেবিলের ধারে ব'সে রোজ যেমন চা খান, সেদিনও তেমনই খাচ্ছেন। ঠোঁটে ধবল, আঙুলে ধবল, চোখের কোলে ধবল জ্যোতিষীটি নিজের আসনটি পাতছেন ফুট্‌পাথের ওপর এদিক ওদিক চাইতে চাইতে। শ্যামবাজারমুখী ট্রামটার শিরোনামায় এস্‌প্ল্যানেড লেখা রয়েছে, হয় ড্রাইভার অন্যমনস্ক, না হয় ঘোরাবার যন্ত্রটা খারাপ হয়ে গেছে। ডানহাতি গলির মোড়টায় শ্বশুরের সহায়তায় সদ্য-বিবাহিত যে যুবকটি মনিহারী দোকানটি সম্প্রতি খুলেছেন, তাঁকে সঙ্গসুখ দান করবার জন্যে যে কজন ছোকরা ওই সঙ্কীর্ণ দোকানের সঙ্কীর্ণতর বেঞ্চিটায় ব'সে রোজ হাসাহাসি করেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র দুজন এসে জুটেছেন দেখলাম, যেটির নেউলের মত মুখ সেইটি এবং নাদুসনুদুসটি। কার বাড়ি থেকে জানি না, বড় বড় লোমওয়ালা ছোট্ট একটা

কুকুর ফুট্‌পাথে বেরিয়ে ছুটোছুটি করছিল, চ্যাপ্টা-গোছের ছোট মুখ—লোমে পরিপূর্ণ, চোখ দেখা যায় না··· ।

চ'লে যেও না হে, দাঁড়াও।

ওধারের ফুট্‌পাথে কমলালেবু দেখতে পেয়েছিলেন ধরণীবাবু। আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে রাস্তা পেরিয়ে সেই দিকে অগ্রসর হলেন, আমি যন্ত্রচালিতবৎ অনুসরণ করলাম। পশ্চিমদেশীয় দোকানদারটির সঙ্গে হাস্যকর হিন্দীতে অনেক দর-কষাকষি করলেন, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। অনেক ধস্তাধস্তির পর টাকায় বত্রিশটা থেকে টাকায় চল্লিশটা দিতে সে যখন রাজি হ'ল, তখন আট আনার লেবু কিনলেন ধরণীবাবু। পাশের একটা মুদীর দোকান থেকে একটা বড় ঠোঙা ভিক্ষে ক'রে আনলেন।

এই সমস্তই এবং আরও নানা ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটেছিল সেদিন সকালে, সমস্তই আমি ধৈর্যভরে সহ্য করেছিলাম সেই শক্তিবলে, যে শক্তি মানুষ লাভ করে আনন্দের প্রেরণায়। আমার দেওয়া তিন খোরাক ব্রোমাইড মিক্‌শ্চার পান ক'রে বংশীর প্রলাপ থেমেছে এবং রাত্রি নিজে এসে সে কথা আমায় ব'লে গেছে, এতেই আমার মন এমন একটা উত্তুঙ্গ লোকে আরোহণ করেছিল যে, এই সব তুচ্ছ ঘটনার সাধ্য ছিল না আমাকে বিচলিত করে।

মনুমেণ্টের ওপর দাঁড়িয়ে সমতলবর্তী লোকজন গাড়ি বাড়ি মোটর এবং তাদের সমন্বয়-বৈচিত্র্য লোকে যেমন নিরুৎসুক

অনুকম্পাভরে দেখে, সেদিন সকালের ঘটনাবলী আমিও সেই রকম উদাসীন দৃষ্টিতে দেখেছিলাম অনেক উর্ধ্বলোক থেকে। যদিও রাত্রির মুখের একটি পেশীও বিচলিত হয় নি, তার নির্নিমেষ দৃষ্টিতে হর্ষের বিন্দুমাত্র আভাসও দেখতে পাই নি, তবু সেদিন কলকাতা শহরের কলরবের মধ্যেও দুটি কথা আমার কানে যেন গান গেয়ে ফিরছিল—"থেমে গেছে"।

৪

স্বর্ণেন্দুর বাসায় যখন পৌছলাম, তখন প্রায় সাতটা বাজে, কিন্তু তখনও সেই অন্ধ গলিটা থেকে অন্ধকার সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নি। গলির শেষ প্রান্তে বাড়িটা আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিল। সরু লম্বা ঈষৎ অন্ধকার গলিটা, তবু তার ভেতর থেকে ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল, কল থেকে চৌবাচ্চায় জল পড়ার একটা একটানা শব্দও ভেসে আসছিল কোথা থেকে যেন, তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে পাশের বাড়ির বারান্দার খোপ থেকে পায়রাটা ডাকছিল তার সঙ্গিনীকে গলা ফুলিয়ে ফুলিয়ে, ঠুনঠুন শব্দ ক'রে একটা রিক্‌শওয়ালা অলস মন্থর গতিতে চলেছিল।

প্রথম রসভঙ্গ হ'ল গলিতে ঢোকবার মুখেই, ধরণীবাবুর কমলালেবুর ঠোঙাটা ফেটে গেল, প'ড়ে গেল দু-চারটে লেবু এবং সেগুলোকে সামলাতে গিয়ে আরও দু-চারটে পড়ল। বিরক্ত

ধরণীবাবু হেঁট হয়ে কুড়োতে লাগলেন সেসব। আমার লোকটাকে ঘোর মিথ্যুক ব'লে সন্দেহ হ'ল। গত তিন মাস যাবৎ ইনি কোমরের বাতের ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন আমার কাছ থেকে; দেখা হ'লেই বলেন, ওষুধে কোন ফল হ'ল না হে, মোটে হেঁট হতে পারি না। স্বচক্ষে দেখলাম, বেশ হেঁট হতে পারছেন তিনি, অথচ সে কথা স্বীকার করেন না কখনও ভুলেও, চিকিৎসা করাচ্ছেন যেন আমাকে বাধিত করবার জন্যেই। মানব-চরিত্রের একটা দিক যেন পরিস্ফুট হ'ল আমার কাছে, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম।

গলির ভেতর ঢুকেই চোখে পড়ল, স্বর্ণেন্দুদের বাসার দরজাটা খোলা রয়েছে। দরজার পাশেই একটা শ্যাওলা-পড়া ছোট চৌবাচ্চা, একটা ভাঙা কলের মুখ থেকে অবিরাম জল পড়ছে তাতে, কাছেই হাতলহীন টিনের একটা মগ প'ড়ে আছে কাত হয়ে।

ধরণীবাবু কমলালেবুগুলো কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়েছিলেন। আমি একাগ্রদৃষ্টিতে খোলা দরজাটার পানে চেয়ে দেখছিলাম। ভাবছিলাম, হঠাৎ হয়তো রাত্রি এসে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করবে, অপরিচিত জ্যোতির্ময়বাবুও হয়তো বেরিয়ে আসতে পারেন। বেশ মনে আছে, এদের দুজনকেই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম; ওই খোলা দরজায় স্বর্ণেন্দুর আবির্ভাব যদিও অসম্ভব ছিল না, কিন্তু কেন জানি না, আমি সেটা প্রত্যাশা করি নি।

কেউ এল না। এটাও বেশ মনে পড়ছে, তাদের না আসার

একটা সঙ্গত কারণও আমি অনুমান ক'রে নিয়েছিলাম ওই অল্প কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। মনে হয়েছিল, সারারাত জেগে এসে ক্লান্ত জ্যোতির্ময়বাবু হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন···রাত্রি হয়তো স্নান করছে···কিংবা হয়তো নিদ্রিত বংশীর মাথার শিয়রে ব'সে হাওয়া করছে আস্তে আস্তে···সমস্ত রাত জেগে স্বর্ণেন্দু হয়তো শুয়েছে একটু··· ।

খোলা দরজাটা দিয়ে আমি আগে ঢুকলাম।

আমার পিছু পিছু ধরণীবাবু।

ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ল পূর্ণেন্দুবাবুর জীবন্ত চোখটা। যদিও তিনি উত্থানশক্তি-রহিত, পাশের ঘরে কি ঘটেছে তা জানবার যদিও কোন উপায় ছিল না তাঁর, তবু আমার মনে হয়, কোন অতীন্দ্রিয় উপায়ে কিছু আভাস যেন পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবন্ত চোখটা যেন তারস্বরে প্রশ্ন করছিল, কি হয়েছে, ও-ঘরে কি হয়েছে, জান তোমরা ?

তাঁর বিছানার পাশেই খালি একটা চেয়ার ছিল। ধরণীবাবুর মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম, নিমেষের মধ্যে তাঁর মুখে প্রাগ্‌জীবনের প্রভুভৃত্য-সম্বন্ধ-জনিত দাস্যভাবটা প্রকট হয়ে উঠল, আকর্ণবিস্তৃত হাসি হেসে সবিনয় নমস্কারান্তে সসঙ্কোচে উপবেশন করলেন তিনি চেয়ারটাতে।

আমি পাশের ঘরে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

স্বর্ণেন্দু যেন দোল খেলেছে। তার জামা, কাপড়, বংশীর

বিছানা সব লালে লাল। রক্ত! চাপ চাপ রক্ত চতুর্দিকে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা হাঁ ক'রে আছে। পাশেই প'ড়ে আছে রক্তাক্ত বাঁকা ছোরাটা, যেটা ফার্নান্‌ডিজ রাত্রিকে উপহার পাঠিয়েছিল তার জন্মদিনে। লাল খাপখানাও প'ড়ে রয়েছে মেঝেতে।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এ কি!

স্বর্ণেন্দু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর তার ছোট্ট হাসিটি হেসে বললে, আমি করেছি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

ঠিক এর অব্যবহিত পরে যা যা ঘটেছিল, তার স্মৃতি আমার মনে অস্পষ্ট নয়, কিন্তু তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করব না। গ্লানিজনক ব'লে নয়, এ কাহিনীর পক্ষে অবান্তর ব'লে। তা ছাড়া লিপিবদ্ধ করবার মত সুসম্বদ্ধভাবে সব কথা আমার মনে নেই। একটা হত্যাকাণ্ড ঘ'টে যাবার পর তাকে লোমহর্ষণ অথবা ওই-জাতীয় কোন একটা বিশেষণে ভূষিত ক'রে আমরা সাড়ম্বরে সাধারণত যা যা ক'রে থাকি, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। পুলিস এসেছিল, খবরের কাগজে সত্যমিথ্যা-কল্পনা-প্রণোদিত সংবাদ বেরিয়েছিল, মকদ্দমা হয়েছিল, তদ্বির হয়েছিল। এমনই যে কিছু একটা নির্ঘাত ঘটবেই, একদিন

ধরণীবাবু মাথা নেড়ে বার বার সে কথা বলেছিলেন। শুধু তাই নয়, অদূরদর্শিতাপ্রযুক্ত এত বড় একটা কাণ্ড চাপা দেবার কল্পনাও করেছিলাম এবং ধরণীবাবু না মানা করলে তা করতে গিয়ে আমি সুদ্ধ যে জড়িয়ে পড়তাম, এ কথা নিজেদের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে জাহির ক'বে আমাব কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করবার চেষ্টাও করেছিলেন তিনি। অনেক ফুসফুস, অনেক গুজগুজ, উক্ত অনুক্ত অনেক চিন্তা, উদ্বেগ-অনুদ্বেগের অভিনয়—কোন কিছুরই ত্রুটি হয় নি। আইনের রথচক্রের আবর্তনে যে পরিমাণ শব্দ ও ধূলি উত্থিত হওয়া স্বাভাবিক, সবই হয়েছিল। সেসবের বিস্তৃত বর্ণনা এ কাহিনীর পক্ষে ক্লান্তিকর। আমি রাত্রির কথা লিখতে বসেছি, স্বর্ণেন্দুব নয়। রাত্রিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে স্বর্ণেন্দুকে আনতে হয়েছে, অন্ধকারকে ভাল ক'রে জানবার জন্যে যেমন আলো জ্বালতে হয়।

ইতিপূর্বে একবার বলেছি, আর একবার স্মরণ কবিয়ে দিতে চাই, এ কাহিনীতে পারম্পর্য নেই, মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক আছে। সেই ফাঁকগুলো আমি আমার কল্পনা দিয়ে ভরাট ক'রে নিয়েছি। আমার এ কল্পনা-বিলাসের হেতু কি, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেন, সত্যের অনুরোধে আমাকে বলতেই হবে, মোহ। এই মোহের বশেই সব জেনেশুনেও রাত্রিব সম্পর্কে আমার মন তিক্ত হয়ে ওঠে নি। এর পরও প্রভাতকে নিষ্কলঙ্ক করবার প্রয়াস আমি করেছিলাম।

এই সময় একটি আশ্চর্য চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস আমি

পেয়েছিলাম, আগে সেই কথাই বলব। চরিত্রটি অসাধারণ। অর্থাৎ এত অসাধারণ যে, সব কথা জানবার পরও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না; মনে হয়, এমন নিগূঢ় কিছু একটা নিশ্চয়ই আছে যা আমি দেখতে পাচ্ছি না, বুঝতে পারছি না, এবং যা দেখতে পেলে বুঝতে পারলে ওই অসাধারণ ব্যক্তিটিকে অনায়াসে সাধারণের পর্যায়ে নামিয়ে আনা যাবে। অসাধারণকে সাধারণের পর্যায়ভুক্ত করবার কি দুর্দমনীয় আগ্রহ আমাদের! কোন কিছুর অসাধারণত্ব আমরা যেন সইতে পারি না। মনে হয়, লোকটা সুদক্ষ অভিনেতা; মনে হয়, মুখোশ প'রে আছে; কিছুতেই মনে হয় না, লোকটা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু এই ব্যক্তিটির কোন মুখোশ নয়নগোচর অথবা বুদ্ধিগোচর যখন হয় নি, তখন তাঁকে আমি অসাধারণ বলতে বাধ্য। বস্তুত, আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন তাঁকে মোটে অসাধারণ ব'লে মনেই হয় নি। সমস্ত ইতিহাস জানবার পর তবে তাঁর অসাধারণত্ব সম্বন্ধে আমি সচেতন হয়েছি। রাত্রির কাহিনীতে এই চরিত্রটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, রাত্রির মায়ের জীবনের বিভিন্ন যুগকে এ চরিত্রটি, শুধু গভীরভাবে নয়, নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে বিভিন্ন সময়ে। সুতরাং, মুখ্যভাবে না হ'লেও গৌণভাবে রাত্রির সঙ্গে এর যথেষ্ট সম্পর্ক আছে।

বিশ্লেষণ করলে এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই একই কারণ আবিষ্কার করা যায়, যা আমি এ প্রসঙ্গের অবতরণিকায় এইমাত্র বললাম। আমরা সহসা অসাধারণকে অসাধারণ ব'লে চিনতে পারি না,

চিনলেও মানতে পারি না, অহঙ্কারবশে মানতে চাই না। রাত্রির মা পরবর্তী জীবনে যাঁকে গুরুদেব ব'লে সকলের কাছে পরিচিত করিয়েছিলেন, পূর্ববর্তী জীবনে যদি তাঁর অসাধারণত্বকে মেনে নিতে পারতেন, তা হ'লে এসব হয়তো কিছুই হ'ত না। রাত্রিরই জন্ম হ'ত না হয়তো।

গুরুদেব-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে দাড়ি-জটা-গেরুয়া-রুদ্রাক্ষ-জাতীয় যেসব জিনিস সাধারণত জড়িত থাকে, রাত্রির মায়ের গুরুদেব রাখালবাবুর সেসব কিছুই ছিল না। নামের পূর্বে স্বামী এবং পরে আনন্দ যোগ ক'রে ধ্বনি-ঝঙ্কার দ্বারা নিজের নাম-মাহাত্ম্য বাড়াবার চেষ্টাও তিনি করেন নি, বস্তুত ধর্ম নিয়ে কোন ভড়ংই ছিল না তাঁর। রাখালবাবু এত বেশি রকম সাদাসিধে ছিলেন যে, তাঁকে দেখলে হঠাৎ নির্বোধ ব'লে সন্দেহ হ'ত। দেহের তুলনায় মাথাটা বড় ছিল তাঁর, চোখ দুটো খুব শান্ত ধরনের ছিল, কিন্তু চোখে অদ্ভুত ধরনের বিস্মিত দৃষ্টি ছিল একটা। মনে হ'ত, সর্বদাই অকৃত্রিম বিস্ময়ভরে যেন তিনি চেয়ে আছেন জগতের পানে। ভাল ক'রে লক্ষ্য না করলেও বোঝা যেত যে, সে বিস্ময় এত গভীর, এত সর্বগ্রাসী যে, অন্য কোন দিকে মন দেবার অবসর নেই তাঁর। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে দেখতে কোন কোন দর্শক যেমন আত্মহারা হয়ে যান, পারি-পার্শ্বিকের সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না, রাখালবাবুও ঠিক তেমনই যেন বিশ্বরঙ্গমঞ্চের সামনে সবিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি নিজেও যে একজন অভিনেতা, সে খেয়াল নেই

তাঁর, অন্যান্য অভিনেতারা আকারে-ইঙ্গিতে তাঁর এই বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েও যেন তাঁকে সচেতন করতে পারছেন না, বাধ্য হয়ে অন্য একজন অভিনেতা এসে তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করছেন, এবং রাখালবাবু একটু স'রে দাঁড়িয়ে সে অভিনয়ও সমান বিস্ময়ে উপভোগ ক'রে চলেছেন। বলা বাহুল্য, এ রকম মনোবৃত্তি অসাধারণ। কিন্তু অসাধারণ কেউ তাঁকে বলে নি। নির্বোধ, কাপুরুষ, পাগল, এমন কি নপুংসকও কেউ কেউ বলেছে তাঁকে শুনেছি। কিন্তু তিনি এসব গ্রাহ্য করেন নি, কারণ গ্রাহ্য করবার মত মনোবৃত্তি থাকলে তিনি আত্মহারা অভিনয়-রসিক না হয়ে আত্মপরায়ণ কলাকুশল অভিনেতা হতেন। এই আত্মবিস্মৃত মনোবৃত্তি ছাড়া আর একটা বর্ম ছিল তাঁর, যাতে প্রতিহত হয়ে সমালোচক বীরপুরুষদের বাক্যবাণ সব ভোঁতা হয়ে যেত শুনেছি।—তাঁর সরল হাসিটি। যে যাই বলুক, বিরুদ্ধ সমালোচনা যত বিষাক্ত যত অসম্মানজনকই হোক না কেন, সরল হাসিটি হেসে তিনি তার নিষ্পত্তি ক'রে ফেলতেন, মনে কোন দাগ পড়ত না। তিনি বোধ হয় ভাবতেন, সমস্তটাই তো অভিনয়, রেগে কি আর হবে! এসব অবশ্য আমার কল্পনা, কারণ আমি তাঁর বিরুদ্ধ-সমালোচকদের দেখি নি এবং তাঁকেও মাত্র একবার কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিলাম। শুনেছি, আর একটা সুবিধে ছিল রাখালবাবুর, এক জায়গায় তিনি বেশিদিন থাকতেন না, ভারতের নানা স্থানে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, প্রধানত তীর্থে তীর্থে। লোকটির পরনে আড়ময়লা কাপড়, হাতকাটা

ফতুয়া, মাথায় কাঁচাপাকা চুল ছোট ছোট ক'রে ছাঁটা, গোঁফ-দাড়ি অযত্নরক্ষিত, অর্থাৎ যদিও তাঁকে আপাতদৃষ্টিতে দরিদ্র ব'লে মনে হ'ত, কিন্তু ব্যাঙ্কে তাঁর অনেক টাকা ছিল এবং অধিকাংশই তার ব্যয় করতেন তিনি দেশভ্রমণে। তাঁর সম্বন্ধে এত সব তথ্য আমি পরে সংগ্রহ করেছিলাম—কিছু রাত্রির কাছে, কিছু ধরণীবাবুর কাছে, কিছু নিখিল চৌধুরীর কাছে। কল্পনাও খানিকটা রঙ ফলিয়েছে। তাঁর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয়েছিল হত্যাকাণ্ডের দিন সকালে। স্বর্ণেন্দুর কাছ থেকে অনেক কষ্টে ঠিকানা যোগাড় ক'রে মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় গিয়ে প্রথমেই যে লোকটিকে দেখেছিলাম, তিনিই রাখালবাবু। তিনি ফতুয়া প'রে বারান্দার এক ধারে ব'সে সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করছিলেন ফুটপাথের ওপর ক্রীড়ানিরত একটি শিশুকে। শিশুটির মাথায় চুল চূড়ো ক'রে বাঁধা, চোখে কাজল, পরনে রঙচঙে পোশাক। পাশের বাড়িতে বোধ হয় বিয়ে ছিল। কাছেই সার সার বাজনদার ব'সে ছিল। আমি বারান্দায় উঠতেই আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালেন—তাঁর সেই শান্ত অথচ কৌতূহলী দৃষ্টি। তিনিই যে রাত্রির মায়ের গুরুদেব, তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি। গুরুদেবের অঙ্গে অন্তত একটা গৈরিক বসনও থাকবে—এ প্রত্যাশা করেছিলাম। তাঁকে গোমস্তা-জাতীয় একটা কিছু ভেবে একটু আদেশের ভঙ্গীতেই বলেছিলাম মনে পড়ছে, বাড়ির ভেতরে একবার খবর দাও তো, বল গিয়ে—স্বর্ণেন্দুবাবুর বাসা থেকে ঘনশ্যামবাবু এসেছেন, বড় জরুরি দরকার। তাঁর সেই

সরল হাসিটি হাসলেন তিনি, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে গেলেন। আমি বারান্দাতেই অপেক্ষা ক'রে রইলাম। একটু পরে তিনি ফিরে এসে বললেন, স্বর্ণেন্দুর মা পুজো করতে বসেছেন, আপনি যদি অপেক্ষা করতে পারেন অপেক্ষা করুন, কিংবা যদি ইচ্ছে করেন, আমাকেও ব'লে যেতে পারেন কি দরকার।

এত বড় একটা নিদারুণ সংবাদ ভৃত্য-জাতীয় একটা লোকের কাছে দেওয়া অসমীচীন বোধ ক'রেই যে আমি অপেক্ষা করা স্থির করলাম তা নয়, কারণ কোন কিছু স্থির করবার মত মাথার ঠিক ছিল না আমার। আমি যন্ত্রচালিতবৎ ঢুকে পড়লাম সামনের ঘরটাতে। রাখালবাবু আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আবার বাইরে গিয়ে বসলেন। শিশুটি তখনও ফুট্‌পাথে খেলা করছিল।

আমার মনটা তখন এমন কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ছিল যে, স্বর্ণেন্দুব মায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুনেই আমি যেন বেঁচে গেলাম, অন্য কোন কারণে নয়, কিছু একটা করতে পেয়ে। বংশীর গলার প্রকাণ্ড ক্ষতটা, রক্তাক্ত স্বর্ণেন্দু, ধরণীবাবুর অন্তর্ধান ও প্রতিবেশীদের নিয়ে আগমন—এ সমস্তকে ছাপিয়ে আমার মনে একটি কথা শিখার মত জ্বলছিল, জ্যোতির্ময়কে নিয়ে রাত্রি স্টেশন থেকে ফেরে নি। বাইরের বারান্দায় যিনি ক্রীড়ানিরত শিশুটিকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিলেন, তাঁর দিকে মন দেবার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার। আমার অন্যমনস্কতা এবং তাঁর

অন্যমনস্কতার অবকাশে তাঁর সঙ্গে সেদিন যতটুকু পরিচয় হয়েছিল, তা স্বল্প ব'লেই স্মৃতি সেটি কৃপণের মত সঞ্চয় ক'রে রেখেছে। তাঁকে সেই আমার প্রথম এবং শেষ দেখা। আর একটু পরিচয় অবশ্য পেয়েছিলাম স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে দেখা হবার পর, অর্থাৎ যখন আবিষ্কার করেছিলাম—ওই আড়ময়লা-কাপড়-পরা আপাতনগণ্য ব্যক্তিটিই রাত্রির মায়ের গুরুদেব, যাঁর সঙ্গে রাত্রির মা ছায়ার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ান সর্বত্র।

২

কতক্ষণ ব'সে ছিলাম মনে নেই।

কিন্তু এটা এখনও বেশ মনে আছে যে, সীমন্তে চওড়া সিঁদুর এবং টকটকে লালপেড়ে গরদ প'রে স্বর্ণেন্দুর মা এসে যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখনও আমি অসাড়ভাবে ব'সেই ছিলাম খানিকক্ষণ, তারপর সহসা উঠে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন ভাষায় আবোল-তাবোল কি যে বলেছিলাম, তা মনে নেই; নিদারুণ দুঃসংবাদটাই জ্ঞাপন করেছিলাম নিশ্চয়।

সমস্ত শুনে স্বর্ণেন্দুর মা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন খানিকক্ষণ।. তাঁর মুখচ্ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে আমার। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অপরাধী যেমন ভাবে দণ্ডাজ্ঞা শোনে, ঠিক যেন তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে তিনি সব শুনলেন। সব শোনবার পর চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন আরও খানিকক্ষণ।

তারপর সহসা যেন ভেঙে পড়লেন, ব'সে পড়লেন ঘরের মেঝের ওপর, কাঁদলেন না, একটি কথা বললেন না। আমি নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু না, যদিও তিনি বরাবর আমার দৃষ্টির সামনেই ব'সে ছিলেন, তবু, খুব সম্ভব বরাবর আমি তাঁকে দেখছিলাম না। শব্দটা শোনবার পর আবার যেন তাঁকে নূতন ভঙ্গীতে নূতন রূপে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম। মাথার অবগুণ্ঠন খ'সে পড়েছে, মুখের ওপর ঘাড়ের ওপর পিঠের ওপর বিস্রস্ত হয়ে নেমে এসেছে আলুলায়িত ঘনকৃষ্ণ কেশভার, বিস্ফারিত চোখ দুটো সামনের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে, নাসারন্ধ্র স্ফীত, মেঝের ওপর দু হাতে ভর দিয়ে দুলছেন তিনি, আর তাঁর সমস্ত অন্তর মথিত ক'রে যে আর্ত শব্দটা উঠছে, তার অনুরূপ শব্দ আমি শুনেছি প্রসব-বেদনাতুরা জননীর মুখে। খানিকক্ষণ পরে সহসা শব্দটা থেমে গেল। বিস্ফারিত চক্ষু দুটো আরও বিস্ফারিত হয়ে স্থির হয়ে গেল, স্থির দৃষ্টিতে কি একটা দেখতে লাগলেন যেন তিনি। তারপর সহসা বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলতে লাগলেন, গৌতমের আশ্রম, এক চাপ কালো কলঙ্কের মত কালো পাথরটা এখনও প'ড়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি ; বৃষ্টিতে গ'লে যায় নি, রোদে ফেটে যায় নি, একটুও ক্ষ'য়ে যায় নি, যুগযুগান্ত ধ'রে ঠিক তেমনই ভাবে প'ড়ে আছে।—এইটুকু ব'লে আবার থেমে গেলেন তিনি, আবার দুলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে আবার ক্রমশ তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত হতে লাগল, আবার কি যেন একটা দেখতে লাগলেন তিনি, আবার দোলা বন্ধ হয়ে

গেল, বক্তৃতার ভঙ্গীতে আবার শুরু করলেন, পাষাণী অহল্যা আজও পাষাণস্তূপ হয়ে প'ড়ে আছে, আজও মুক্তি হয় নি তার, অনেক শাস্তি বাকি আছে, অনেক রোদ-বৃষ্টি-বজ্রপাত সহ্য করতে হবে এখনও। তারপর দু হাত মেঝের ওপর প্রসারিত ক'রে লুটিয়ে পড়লেন, কোথায় তুমি নবজলধরশ্যাম রামচন্দ্র, এস, দয়া কর, অভয় চরণের স্পর্শ দিয়ে পাষাণী অহল্যাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও—

নিস্পন্দ দেহটা প'ড়ে রইল মেঝের ওপর। স্বর্ণেন্দুর মুখে শুনেছিলাম, তার মায়ের মাঝে মাঝে 'ভর' হয়—এই কি? হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, রাখালবাবু উঠে এসেছেন কখন বারান্দা থেকে এবং সবিস্ময়ে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে। তাঁর সে নির্বিকার অথচ বিস্মিত দৃষ্টি কোন দিন ভুলব না আমি। খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি রাত্রির মায়ের পাশে গিয়ে বসলেন, অতিশয় স্নেহভরে তাঁর মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগলেন, তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে আমার মনে হতে লাগল, তিনি ঠিক সান্ত্বনা দিচ্ছেন না, তিনি যেন কোন অভিনেত্রীকে অভিনয়-কুশলতার জন্য নীরবে বাহবা দিচ্ছেন।

চল, ওঘরে চল।

রাত্রির মা বেশবাস সম্বৃত ক'রে উঠলেন এবং তাঁর অনুসরণ ক'রে পাশের ঘরে গেলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

খানিকক্ষণ পরে শুনতে পেলাম, রাখালবাবু বলছেন, তুমি যদি স্বর্ণেন্দুর মকদ্দমার জন্যে থাকতে চাও, থাক, আমি

কাল হরিদ্বারে চ'লে যাই, টাকাকড়ির সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাচ্ছি।

তুমি আমাকে থাকতে বল ?

আমি কিছুই বলি না—একটু থেমে—কোন দিনই তো কিছু বলি নি।

তারপর খানিকক্ষণ নীরবতা। তারপর সহসা পাশের বাড়িতে বিয়ের বাজনা বেজে উঠল একসঙ্গে। আর শুনতে পেলাম না কিছু। একটু পরে বেরিয়ে এলেন রাখালবাবু, শান্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন আমার দিকে কয়েক সেকেণ্ড, তারপর বললেন, আপনার পুরো নামটা কি ?

ঘনশ্যাম সবকার।

সরকার ? 'আই' দিয়ে বানান করেন, না 'এ' দিয়ে ? 'কে' না 'সি', সেটাও বলবেন দয়া ক'রে।

বললাম। তিনি একটা ড্রয়ার টেনে একটা চেক-বুক আর কলম বার করলেন, তারপর একটা চেক কেটে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, হাজার টাকার একখানা চেক। চেক থেকে চোখ তুলতেই তিনি বললেন, আমরা কাল হরিদ্বার যাচ্ছি। স্বর্ণেন্দুব মকদ্দমার তদ্বির যাতে হয়, দেখবেন দয়া ক'রে।

ব'লেই ভেতরে ঢুকে গেলেন। আমি এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, তাঁকে প্রণাম করতে ভুলে গেলাম।

এঁদের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

গোটা পাঁচেক অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণকায় লোক গোটা তিনেক ঢোল আর গোটা দুই সানাই নিয়ে কি ভীষণ শব্দ-প্রভঞ্জন সৃষ্টি করতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। ওদের শীর্ণ দেহের পেশীতে যতটা শক্তি আছে সমস্তটা প্রাণপণে প্রয়োগ ক'রে সুর-সৃষ্টি ক'রে চলেছে ওরা, রঙিন-কাপড়-পরা নানা বয়সের এক দল মুগ্ধ শ্রোতাও দাঁড়িয়ে রয়েছে আশেপাশে, আড়ময়লা কয়েকটা রাজহাঁস তাদের বাচ্চাগুলিকে আগলে খুব নির্বিকার-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওদের কাছে-পিঠেই, বাচ্চাগুলি যেন পাঁশুটে রঙের তুলো দিয়ে তৈরি, ভবিষ্যৎ রাজহাঁস যে ওদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বোঝা যায় না সহসা; ঢোল আর সানাই সম্বন্ধে ওরা উদাসীন, রাস্তার নালা থেকে আহার সংগ্রহের দিকেই ওদের বেশি আগ্রহ।...নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত গাম্ভীর্যকে বিচলিত ক'রে একটা খামখেয়ালী দুরন্ত হাওয়া গুড়োমুড়ি ক'রে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে, লুটোপুটি করছে গাছের পাতায়, ছুটোছুটি করছে রাস্তার ধুলোয়, ছেঁড়া কাগজ শুকনো পাতাদের নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নিজের খেয়াল-খুশিতে। ঢোল আর সানাই সমানে বেজে চলেছে, তাদের উচ্চনিনাদকে বিক্ষত ক'রে একটা কাঠবেড়ালি অশ্বত্থগাছের ডালে পুচ্ছোৎক্ষেপসহকারে ডাকছে—চিক-চিক-চিক। মুচীটা নেই; কইলুর বদলে আর একজন

লোক এসেছে, কন্ঠিপরা ভক্ত-গোছের। ময়দা-কলের আকাশ-চুম্বী চিমনিটা থেকে খুব ঘন কালো রঙের ধোঁয়া খুব আস্তে আস্তে নিঃশব্দে কুণ্ডলাকারে বেরুচ্ছে। ঈশান-কোণে পুঞ্জীভূত মেঘটায় মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হচ্ছে, একটু পরে কাল-বৈশাখীর যে তাণ্ডব শুরু হবে, তারই মহড়া চলছে বোধ হয় ওখানে। "সীত্তারাম, সীত্তারাম বোলো ভাই" গর্জন করতে করতে সামনের গলি থেকে ষণ্ডা-গোছের একটি লোক বেরুল, তার হাতে চকচকে একটা ঘটি, কপালের মাঝখানে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, এদিক ওদিক চেয়ে সশব্দে একবার উদ্গার তুললে, তারপর আবার "সীত্তারাম বোলো, সীত্তারাম বোলো ভাই" বলতে বলতে চ'লে গেল; এক পাল নধরকান্তি গাভী প্রকাণ্ড একটা ষণ্ড-সমভিব্যাহারে হেলতে দুলতে মন্থরগমনে পার হয়ে গেল রাস্তাটা; এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসল সামনের বাড়ির ছাতে; একটা ছুটন্ত গরুর গাড়ির ছইয়ের ভেতর থেকে কমলা-রঙের ওড়না-গায়ে পরদানশীন একটি মেয়ে পরদাটি একটু ফাঁক ক'রে কৌতূহলভরে দেখতে দেখতে চ'লে গেল।... ভাবছি, বাংলার বাইরে নিদাঘ-দ্বিপ্রহরের এই পরিবেষ্টনীর মাঝখানে কলকাতা শহরের সেই সন্ধ্যাটি আমি মূর্ত ক'রে তুলতে পারব কি না, যে সন্ধ্যায় কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে নিখিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

সেদিন একটু আগেই এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, গুমট গরমটা আরও যেন বেড়ে উঠেছিল তাতে। নিখিল

চৌধুরী ট্রাম থেকে নামলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, ভালই হ'ল, চলুন, যাওয়া যাক। আমি প্রায় পনরো দিন কলকাতায় ছিলাম না। বিষয়-সংক্রান্ত ব্যাপারে দেশে গিয়েছিলাম। সঙ্গে যে কয়টা বই নিয়েছিলাম, শেষ হয়ে গিয়েছিল। বই কিনতেই বেরিয়েছিলাম। একটা পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কতকগুলো উপন্যাস বেছে রেখে দরদস্তুর করতে যাচ্ছিলাম। ভালই হ'ল, চলুন, যাওয়া যাক।—এই কথাগুলো নিখিল যদিও খুব স্বাভাবিক কণ্ঠেই উচ্চারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার মনে হ'ল, তাঁর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ঠিক সেই ধরনের একটা স্বস্তির নিশ্বাসও যেন নির্গত হ'ল, যে ধরনের স্বস্তির নিশ্বাস কোন মজ্জমান ব্যক্তির বক্ষ ভেদ ক'রে নির্গত হওয়া স্বাভাবিক—সামনে একটা নৌকো বা ভেলা দেখলে। আমি বইগুলো দাম দিয়ে বগলে ক'রে নিলাম, দরদস্তুর করবার সময় হ'ল না। নিখিল চৌধুরীর পানে তির্যক দৃষ্টিতে একবার চেয়ে বললাম, কেন, ব্যাপার কি?

বিরক্তিকর, চলুন না।

মজ্জমান ব্যক্তির নিশ্বাসের আভাস আর পেলাম না, নিখিল তখন সামলে নিয়েছেন। নীরবে অনুসরণ করলাম নিখিল চৌধুরীকে।

কলেজ স্ট্রীটের মোড় তখন চতুর্মুখী জন-স্রোতের সংঘর্ষে তুমুল হয়ে উঠেছে। চারিদিকে সারি সারি ট্রাম, সারি সারি মোটর, রিক্‌শ, ফিটন-গাড়ি, গরুর গাড়ি, ফেরিওয়ালা,

ঝাঁকামুটে, খবরের কাগজের হুকার, প্যাচপেচে কাদা, অসংখ্য মানুষ নানা রকমের। আমরা একটু স'রে গিয়ে দেলখোশ কেবিনের সামনা-সামনি হ্যারিসন রোডটা পেরিয়ে যাব ঠিক করলাম ট্রামগুলো বেরিয়ে গেলেই। সারি সারি অনেকগুলো ট্রাম দাঁড়িয়ে ছিল, একটা গরুর গাড়ি উল্টেছিল ট্রাম-লাইনে। পিছু ফিরে দেখলাম, দেলখোশ কেবিন উপচে পড়ছে, একটুও স্থান নেই, এক কাপ চা খেয়ে সময়টা অতিবাহিত করবার ইচ্ছাটিকে বিসর্জন দিতে হ'ল; সামনে নবীন ফার্মেসির দোকানে লাল নীল রঙের জল-পোরা বড় বড় কাচের জালাগুলো ইলেক্‌ট্রিক আলোর দৌলতে বিস্ময়জনক হয়ে উঠেছে; কেষ্টদাস পালের প্রতিমূর্তির নীচে বেলফুলের মালা, নানা রকম ছবি, টুকি-টাকি জিনিস, লাল রঙের চীনে ফানুস বিক্রি হচ্ছে; ওভার্টুন হলে কোন বক্তৃতা হচ্ছিল বোধ হয়, শেষ হয়ে গেল, গলগল ক'রে লোক বেরুতে লাগল ওয়াই. এম. সি. এ.-র দরজা দিয়ে। নিখিল চৌধুরী যে ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন, ক্ষণিকের জন্যে সে কথাও ভুলে গেলাম অন্যমনস্ক হয়ে। কলকাতা শহরে প্রতি মুহূর্তে এত বিচিত্র উত্তেজনা যে, কোন উত্তেজনাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পায় না, ছায়াবাজির মত হয় আর মিলিয়ে যায়। সচেতন মনের ওপর দিয়ে প্রতিক্ষণেই নতুন একটা মিছিল চলছে যেন। মানুষ কতক্ষণ মনে রাখবে, কাকে মনে রাখবে? চলমান মিছিলের প্রতি অংশটাই সচল, বিস্ময়কর, উত্তেজনাজনক। মন দিশাহারা হয়ে আত্মরক্ষার্থেই বোধ হয়

উদাসীন হয়ে পড়ে শেষটা। না, ঠিক সেই মুহূর্তে ছ মাস আগের ঘটনা আমার মনে ছিল না। সেই মুহূর্তে আমি মোড়ের ঘড়িটার দিকে চেয়ে সক্ষোভে ভাবছিলাম, এম্পায়ারে আজ ভাল একটা নাচ ছিল, নিখিল চৌধুরীর পাল্লায় প'ড়ে যাওয়া হ'ল না। হঠাৎ ট্রাম-লাইন পরিষ্কার হয়ে গেল, ঘড়াং ঘড়াং শব্দ ক'রে ট্রামগুলো চলতে লাগল, আমরা দুজনে ট্যাক্সি, রিক্‌শ, জনতার ফাঁকে ফাঁকে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হ্যারিসন রোড পার হয়ে গেলাম।

নিখিলবাবু আর একটিও কথা বলেন নি। গলিতে ঢুকে আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার কি বলুন তো, চামেলি আজ ভাল কিছু বেঁধেছে নাকি? নিখিল চৌধুরী গলিতে ঢুকেই পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করেছিলেন, আমার কথা শুনেই ঢাকনি খুলে এক টিপ তুলে নিলেন এবং আমার দিকে চকিতে এক নজর চেয়ে একটু দাঁড়িয়ে নস্যিটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে রুমাল দিয়ে নাকের আশপাশ ঝেড়ে পুনবায় ভাল ক'রে চাইলেন। তাঁর দৃষ্টি আমাকে যেন কশাঘাত করলে। আমি বিস্মিত হয়ে পুনবায় বললাম, ব্যাপার কি বলুন তো?

নিখিলবাবু স্ফুটকণ্ঠে একটু ধমকের সুরে বললেন, চলুন।

তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর!

নীরবেই পথ অতিবাহন করতে লাগলাম দুজনে।

২

নিখিলবাবুর বাসার ছাতে দুজনে নীরবে ব'সে ছিলাম। কাছে কোন আলো ছিল না, পাড়াতেই কাদের বাড়িতে যেন গ্রামোফোন বাজছিল। হু-হু ক'রে একটা দক্ষিণে বাতাস উঠল। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব'সে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর বিচারের শেষ নিষ্পত্তি যে হয়ে গিয়েছে, তা আমি জানতাম না। আমি যে স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে ইচ্ছে ক'রে নির্বিকার হয়ে ছিলাম তা নয়, হাজার টাকার চেক দিয়ে রাখালবাবু আমাকে যে অনুরোধ করেছিলেন দু মাস আগে, আমি যে তার মর্যাদা রক্ষা করি নি তাও নয়। আমি সেই দিনই চেকটা নিখিলবাবুর হাতে দিয়ে তাঁকে ব'লে এসেছিলাম, আইনত বে-আইনত যে কোন উপায়ে হোক স্বর্ণেন্দুকে বাঁচাতে হবে। নিখিলবাবু রাজি হয়েছিলেন, কিন্তু চেকটি তিনি ভাঙাতে চান নি, পরে ভাঙিয়েছিলেন কি না, তা আমি জানি না। নিখিলবাবু ভাল উকিল, স্বর্ণেন্দুর আত্মীয়। যতটা করা সম্ভব ততটা তিনি নিশ্চয় করবেন, এ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের ওপর নির্ভর ক'রেই যে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, এটা ওজুহাতস্বরূপ খাড়া করতে পারি, কিন্তু কারণটা আসলে তা নয়। তা ছাড়া আমি স্বর্ণেন্দুর সম্বন্ধে সত্যিই নির্বিকার ছিলাম না, সত্যিই তার কথা উদ্বিগ্নভাবে আমি ভাবতাম মাঝে মাঝে। সে যে নির্দোষ, সে সম্বন্ধেও আমার কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু এটা ঠিক,

স্বর্ণেন্দুর চেয়ে রাত্রির কথাই আমি বেশি ভেবেছি, যদিও তার মধ্যেও যে বিস্মৃতি ছিল না, তা নয়। এদের সম্বন্ধে আমার মন সর্বতোভাবে সর্বদা উন্মুখ ছিল না, তার একমাত্র কারণ বোধ হয় এই যে, আমার চিত্তবৃত্তি মানবীয়, কোন উত্তেজনার প্রভাবেই উৎসাহের উচ্চশীর্ষে বেশিক্ষণ টিঁকে থাকতে পারে না, নেমে পড়ে। স্বর্ণেন্দুকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাবার পরদিন থেকেই তা নামতে শুরু করেছিল এবং সাত দিনের মধ্যেই কলকাতা শহরের এবং আমার ডাক্তারী-জীবনের নব নব উত্তেজনার মধ্যে নিজেকে আবার হারিয়ে ফেলেছিল। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পূর্ণেন্দুবাবুর ভার যখন তাঁর এক মামাতো ভাই এসে নিলেন এবং তাঁর দূর-সম্পর্কের জামাই নিখিলবাবু যখন তাঁর তত্ত্বাবধান করবার দায়িত্ব স্বীকার করলেন, তখন আমার আর কিছুই করবার রইল না। বস্তুত সামাজিক কোন বন্ধন না থাকাতে আমি আরও যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। এদের সঙ্গে আমার বন্ধনটা সত্যিই আকস্মিক। সেদিন স্টেশন-প্ল্যাট্‌ফর্মে রাত্রি যদি আমাকে অভিভূত না করত, তা হ'লে আমি এদের নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না, স্বর্ণেন্দুকে ভাল ক'রে লক্ষ্য করবার সুযোগ, এমন কি প্রেরণাও পেতাম না সম্ভবত। কর্তব্যবোধে আমি স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে জেলে একবার দেখা করতেও চেয়েছিলাম, স্বর্ণেন্দুই দেখা করে নি। আইনের কবলে প'ড়ে বংশীর চিকিৎসক হিসেবে আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিতে হয়েছিল। আমি যা জানতাম, (যা সন্দেহ করতাম, তা নয়) যথাযথ বলেছিলাম,

সত্যনিষ্ঠার জন্যে নয়, বাধ্য হয়ে। বানিয়ে দু-চারটে মিছে কথা বললে স্বর্ণেন্দুর যদি কোন সুবিধে হ'ত, আমি নিশ্চয়ই বলতাম, কিন্তু সে সুযোগই পাওয়া যায় নি। সেদিন সকালে সেই যে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তার ছোট্ট হাসিটি হেসে স্বর্ণেন্দু আমাকে বলেছিল, আমি করেছি, সে কথা আর সে প্রত্যাহার করে নি। যে নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করে, তাকে আইনের কবল থেকে বাঁচাবে কে?

শুধু নিজের মুখে নয়, নিজের হাতে লিখে সে দোষ স্বীকার করেছিল। সে লিখে দিয়েছিল যে, সেদিন সন্ধ্যাবেলা তার মা মির্জাপুর স্ট্রীটের বাসায় তাঁব গুরুদেবের কাছে চ'লে গিয়েছিলেন, তার বোন রাত্রিও মধুপুরে যাবার জন্যে চ'লে গিয়েছিল ভোর-বেলা, পাশের ঘরে বাবা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি উত্থানশক্তি-রহিত—এই সুযোগে সে স্বহস্তে ছোরা দিয়ে বংশীকে খুন করেছিল কোন বিশেষ কারণে। কারণটা কি, তা সে বলবে না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুর মা, স্বর্ণেন্দুর বাবা এবং রাত্রিকেও তলব করেছিল সাক্ষী হিসেবে। স্বর্ণেন্দুর বাবা কিছুই শোনেন নি। পুলিস আসবার সময় তাঁকে একটু আড়ালে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, তারপর সেই দিনই তাঁকে তাঁর মামাতো ভায়ের বাড়িতে সরিয়ে ফেলা হয়। তিনি নাকি বাঁ হাতে লিখে লিখে স্বর্ণেন্দু, রাত্রি এবং বংশীর কথা জিজ্ঞেস করতেন নিখিলবাবুকে, কোথায় গেল এরা সব? নিখিলবাবু নানা রকম মিছে কথা ব'লে

স্তোক দিতেন। স্বর্ণেন্দুর বাবাকে সাক্ষী দিতে হয় নি, নিখিল-বাবু পুলিসকে ব'লে সে ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। স্বর্ণেন্দুর মা সাক্ষী দিতে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, কারণ ঠিক সেই দিনটি আমি কলকাতার বাইরে ছিলাম। স্বর্ণেন্দুর মা স্বর্ণেন্দুর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, স্বর্ণেন্দু দেখা করে নি। রাত্রিকে মধুপুরে পাওয়া যায় নি। তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল বম্বেতে একটা হোটেলে, সেখানে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে সে ছিল। তার অসুখ করেছিল ব'লেই সে নাকি আসতে পারে নি, তার বদলে একটা ডাক্তারের সার্টিফিকেট এসেছিল। তবু কমিশনে সাক্ষী নেওয়া হয়েছিল তার। সে বলেছিল, সে বংশীকে অসুস্থ দেখে এসেছিল, এর বেশি আর কিছু সে জানে না। স্বর্ণেন্দু তার স্বীকারোক্তির এক বর্ণও প্রত্যাহার করে নি। নিখিলবাবু যে শেষ চেষ্টা করেছিলেন, তাও সফল হয় নি। কিছুতেই তাকে পাগল ব'লে প্রমাণ করা গেল না। ডাক্তারবা পর্যবেক্ষণ ক'রে মত দিলেন যে, তার মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ সুস্থ। সে রীতিমত খায়, ঘুমোয়, সুস্থ লোকের মত আলাপ করে।···সব শেষ হয়ে যাবার পর নিখিল চৌধুরীর মুখে আমাকে এই সব বিবরণ শুনতে হচ্ছিল, আমি নিজে সাগ্রহে ঔৎসুক্যভরে স্বয়ং এগুলো সংগ্রহ করি নি ব'লে নিজের কাছেই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলাম। দূরে গ্রামোফোন বাজছিল, হু-হু ক'রে দক্ষিণে হাওয়াটা বইছিল, নিখিলবাবুর ছাতে অন্ধকারে একটু অপ্রস্তুত হয়ে ব'সে ছিলাম আমি।

এসব সত্ত্বেও ওর হয়তো ফাঁসি হ'ত না, যদি না অ্যানার্কিজ্‌মের ফ্যাঁকড়াটা উঠত।—এই ব'লে নিখিল চৌধুরী সশব্দে নস্যি টেনে নিলেন।

অ্যানার্কিজ্‌মের ফ্যাঁকড়া মানে?

আপনি শোনেন নি কিছু?

মনে মনে আর একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না।

পুলিস স্বর্ণেন্দুকে একজন ফেরারী অ্যানার্কিস্ট ব'লে সনাক্ত করেছিল, একটা নয়, দু-তিনটে পলিটিক্যাল খুনের সঙ্গে ওর নাকি যোগ ছিল, ওকেই ওরা নাকি খুঁজছিল, বংশীর অ্যাপ্রুভার হবার সম্ভাবনা ছিল ব'লেই নাকি বংশীকে ও খুন করেছে—এই ওদের থিওরি।

নিখিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন এবং ছাতে পায়চারি করতে করতে লাগলেন। আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

বিরক্তিকর!

আবার এসে বসলেন নিখিল চৌধুরী।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ঝুঁকে নিষ্ফল আক্রোশে যেন চাপা গর্জন ক'রে বললেন, আর জানেন, স্বর্ণেন্দু হাসিমুখে তাও মেনে নিলে! ড্যাম হিজ হাসি!

আবার উঠে পায়চারি করতে লাগলেন।

একটু ইতস্তত ক'রে এবং রূঢ় সত্যটা শোনবার জন্যে মনকে যথাসম্ভব প্রস্তুত ক'রে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার ফাঁসির দিন কবে?

ফাঁসি কাল হয়ে গেছে।

হাওয়াটা থেমে গেল না, দূরের বাড়ির গ্রামোফোনও সমানে বাজতে লাগল। চামেলি এসে খবর দিলে, খাবার দেওয়া হয়েছে। নীরবে নীচে নেমে গেলাম। ফাউলের ফ্রেঞ্চ কাট্‌লেট, সুগন্ধি রাঁদনি চালের ভাত, চমৎকার মুগের ডাল, সবই উপাদেয় হয়েছিল। তবু কি একটা তুচ্ছ কারণে চামেলিকে ধমকালেন নিখিলবাবু। চামেলি নীরবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল হাসিমুখে। অর্থাৎ সবই যেমন হয়, হতে থাকল। স্বর্ণেন্দুর ফাঁসি হয়ে গেছে ব'লে কিছুই আটকাল না, কিছুই বদলাল না। স্বর্ণেন্দু যে নির্দোষ, এ কথা নিঃসংশয়ে জেনেও আমার আহারে রুচি কিছুমাত্র কমল না, আমি বেশ খেতে লাগলাম। স্বর্ণেন্দু আদালতে যে মিছে কথা বলেছিল, তার একটা প্রমাণ তো এখনই স্বকর্ণে শুনলাম। রাত্রির যে সেদিন ভোরে মধুপুর চ'লে যাওয়ার কথা ছিল না, স্বর্ণেন্দু তা জানত। রাত্রি স্টেশনে গিয়েছিল জ্যোতির্ময়কে আনতে, কিন্তু ফেরে নি।

নিখিলবাবু তৃতীয় কাট্‌লেটটি নিঃশেষ ক'রে চতুর্থটি আক্রমণ করতে করতে সহসা বললেন, কিন্তু এই দুঃসংবাদটা দেবার জন্যেই আপনাকে টেনে আনি নি। অধিকতর দুঃসংবাদ একটা আছে।

আবার কি ?

রাত্রি পরশুদিন আসছে অবনীশের সঙ্গে বম্বে থেকে।

এই সংবাদে আমার মুখভাব কি রকম হয়েছিল, তা বলতে পারি না ; কিন্তু তা লক্ষ্য ক'রেই নিখিলবাবু সম্ভবত বললেন,

অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলে চলবে না, আপনাকেই ধাক্কাটা সামলাতে হবে। তারা আমার বাসাতেই এসে উঠবে লিখেছে। অবনীশবাবু লিখেছেন, কি একটা জরুরি কাজ আছে তাঁর। কিন্তু আমি থাকব না, আপনিই জরুরি দরকারটা সামলে দেবেন আমার হয়ে।

আপনি কোথা যাচ্ছেন ?

অপ্রত্যাশিত একটা সংবাদ দিলেন নিখিল চৌধুরী।

বিয়ে করতে।

বিয়ে করতে! এতদিন পরে হঠাৎ এ খেয়াল ?

খেয়াল নয়, প্রয়োজন। স্বাভাবিক সামাজিক জীবন যাপন করতে গেলে বিয়ে করা দরকার। অস্বাভাবিক উত্তেজনার মধ্যে প্রতিভাবান ব্যক্তিরাই সুখে থাকতে পারে, আমরা পারি না।

তারপর একটু হেসে বললেন, তা ছাড়া, চামেলিটাকে শায়েস্তা করবার লোক দরকার একজন। এদানীং ও বড্ড বেড়েছে।

ঠিক উৎসুক হয়েছিলাম ব'লে নয়, এই প্রসঙ্গে একটা কিছু বলতে হয় ব'লে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় বিয়ে করছেন ?

ঘোর পাড়াগাঁয়ে, কালো কুচ্ছিত একটা হাঁদা মেয়েকে। তার একমাত্র গুণ, সে স্বাস্থ্যবতী। সুন্দরী স্লিম বুদ্ধিমতী দেখে দেখে অরুচি জন্মে গেছে।

নিরর্থক জেনেও বললাম, আপনার মত লোকের এ রকম বিয়ে করার—

আমার কথা শেষ হতে না দিয়েই নিখিল বললেন,

বংশরক্ষার্থে। এবং তারপর একটু থেমে অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, বিরক্তিকর!

উভয়ে নীরবেই আহার করতে লাগলাম।

আমার মনের মধ্যে একটি চিন্তা মেঘের মত নানা ভাবে নিজেকে প্রসারিত করছিল,—রাত্রি আসছে, জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে নয়, অবনীশের সঙ্গে। স্বর্ণেন্দু নেই, নিখিলবাবুও থাকবেন না।

সহসা প্রভঞ্জন থেমে গেল।

সানাই ঢোল একসঙ্গে নীরব হ'ল। নিবিড় স্তব্ধতা ঘনিয়ে এল চতুর্দিকে। স্তব্ধতাকে বিক্ষত ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কাঠবেড়ালিটা ডাকছে কেবল, চিক-চিক-চিক-চিক।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

কার্যকারণের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। এর পরে যা ঘটেছিল, তারও একাধিক কারণ ছিল, যদিও সে কারণগুলো তখন আমার মনে তত স্পষ্ট ছিল না, এখন যতটা হয়েছে। সমস্ত জিনিসটা পর্যালোচনা ক'রে এখন আমি এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছি (যদিও সেটা মাসীর গোঁফ গজালে মামা হ'ত গোছ হাস্যকর সিদ্ধান্ত), যাই হোক, এই কথাটাই এখন আমার মনে হয় যে, অবনীশের ব্যবসায় এবং সামাজিক বুদ্ধি যদি আর একটু কম প্রকট হ'ত, সেদিন গভীর নিশীথে নিখিল চৌধুরীর ছাতে

প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে রাত্রির কান্না যদি না দেখতাম এবং মোহের প্ররোচনায় প'ড়ে নিজেকে কুসংস্কারহীন অতি-আধুনিক আত্ম-ত্যাগী ব'লে, শুধু প্রচার নয়, প্রমাণ করবার উৎকট আকাজ্ক্ষা যদি আমাকে না পেয়ে বসত, তা হ'লে হয়তো এমন হ'ত না। শেষোক্ত কারণটাকেই মুখ্য বলতে আমি রাজি নই—যদিও অবণীবাবু এবং নিখিল চৌধুরীর তাই মত, কারণ আগের দুটোর অস্তিত্ব না থাকলে আমার মোহ নিজেকে জাহির করবার সুযোগ এবং সম্ভবত প্রেরণাও পেত না। গাছের উদ্ভবের জন্যে মাটি এবং বীজ উভয়েরই সমান প্রয়োজন।

অবনীশের কথা চিন্তা করলেই আমার খুব ছেলেবেলায় দেখা এক স্টেশন-মাস্টারের কথা মনে পড়ে। স্টেশনের নাম মনে নেই, কোন্ রেলওয়ে তাও মনে নেই, তবে ছবিটা স্পষ্ট মনে আছে। স্টেশনটা খুব ছোট, এক মিনিটের বেশি কোন গাড়িই সেখানে বোধ হয় থামে না। স্টেশনেরই এক অংশে স্টেশন-মাস্টারের কোয়ার্টার। চারিদিকে ধু-ধু করছে মাঠ। আমাদের ট্রেন যখন সেখানে পৌঁছল, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। অস্তগামী সূর্যের লাল আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। স্টেশনের পাশেই একটি নধরকান্তি গাই বাঁধা রয়েছে, আর নিকটেই একটি বলিষ্ঠ-গঠন প্রৌঢ় ব্যক্তি হেঁট মুখে খালি গায়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে জাব মেখে চলেছেন। দু হাতের কনুই পর্যন্ত খোল-খড়-মাখা। ট্রেন এসে দাঁড়াতেই তিনি জাবের ডাবা থেকে মুখ তুলে ডাকলেন, কই রে ফাগুয়া? ফাগুয়া স্টেশনের ভেতর থেকে একটা টুপি নিয়ে ছুটে বেরিয়ে

এল এবং সেটা তাঁর মাথায় পরিয়ে দিলে। টুপিতে লেখা রয়েছে এস. এম.। তিনি খোল-খড়-মাখা ডান হাতটা তুলে বললেন, অল রাইট, অল রাইট। ফাগুয়া ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা বাজালে, লাইন ক্লিয়ার দিলে, গার্ড সাহেব হুইস্‌ল দিলেন, ট্রেন চলতে লাগল। অবনীশের সঙ্গে এই স্টেশন-মাস্টারের বাহ্যিক কোন সাদৃশ্য নেই, কিন্তু মূলত মিল আছে। দুজনেই বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ঘোর স্বার্থপর, দুজনেই শ্যাম এবং কুল দুই-ই বজায় রাখতে অশোভনভাবে ব্যস্ত। অবনীশের চেহারাটা দেখে হঠাৎ তাকে খুব খারাপ লোক ব'লে মনে হয় না। খুব বেঁটে সায়েবী-পোশাক-পরা শ্যামবর্ণ লোকটি, পুরু ঠোঁট, ভুঁড়ো নাক; কিন্তু সমস্ত মুখখানাতে এমন একটা সদা-সপ্রতিভ ভাব আছে যে, তাতেই মুখখানা কিঞ্চিৎ শ্রীসম্পন্ন হয়েছে। দেখলেই, অর্থাৎ পরিচয় পাওয়ার আগে, মনে হয়, লোকটি নির্ভরযোগ্য, ভেতরে শক্তি আছে। পরিচয় পেলে মনে হয়, শক্তি আছে বটে, কিন্তু সে শক্তির এক বিন্দু তিনি অপচয় অর্থাৎ অপরের জন্যে ব্যয় করতে রাজি নন। মাথায় হ্যাট আছে, ছোট একটি টিকিও আছে। দুটোই তিনি শিরোধার্য করেছেন, আমার মনে হয়, ব্যবসার খাতিরে; নিরামিষ আহার করাটাও বোধ হয় ব্যবসার অঙ্গ। এ দেশে বিশুদ্ধ ঘিয়ের ব্যবসা করতে হ'লে এসব চাই।

চামেলির মুখে যখন খবর পেলাম যে, রাত্রিকে নিয়ে অবনীশ-বাবু এসে পৌঁছেছেন, তখন আমার মনে আশার চেয়ে আশঙ্কাই বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল। অনেকদিন আগে শোনা স্বর্ণেন্দুর

কথাগুলো মনে হয়েছিল, সে কখনও মুখ ফুটে কিছু বলবে না ব'লে সব জেনে শুনেও তাকে এমন একটা লোকের হাতে দিতে হবে, যাকে সে মোটে পছন্দ করে না? ভয় হয়েছিল, প্রবল-পরাক্রান্ত অবনীশের কবল থেকে রাত্রিকে উদ্ধার করবার মত সামর্থ্য হয়তো আমার নেই। রাত্রির ওপর আমার কি জোর আছে, কোন্ অধিকারে আমি এর বিরুদ্ধাচরণ করব?

নিখিলবাবুর বাসায় এসেই অবনীশের সঙ্গে দেখা হ'ল। নীচের বসবার ঘরে একাই ব'সে ছিলেন তিনি, হাতে একটা পেন্সিল ছিল। আমাকে দেখেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং সপ্রতিভভাবে বললেন, আসুন, আপনিই আশা করি ডক্টর সরকার, আমি অবনীশ।

নমস্কারান্তে বসলাম।

আমাকে কিছু বলবার অবকাশ না দিয়েই আবার বললেন, আচ্ছা, বাই এনি চান্স, আপনি বড়বাজারেব ঘিয়েব আড়তদার কাউকে চেনেন?

না।

কোনও ব্রোকার?

না।

ঠোঁট দুটো ফাঁক ক'রে পেন্সিল দিয়ে সামনের একটা দাঁতে আস্তে আস্তে টোকা দিতে লাগলেন চিন্তিত মুখে। তাবপর হঠাৎ টেলিফোন-গাইডটা খুলে একটা নম্বর খুঁজে বার ক'রে

ফোন করলেন কাকে, ফোনে ঘি সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল হিন্দীতে।

এতদিন অবনীশ আর রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে পূর্বরাগরঞ্জিত যে কুয়াশাটা আমার মনে সঞ্চিত হয়েছিল, একটা আচমকা দমকা হাওয়ায় সেটা যেন ছিন্নভিন্ন, হয়ে গেল। ফুটকি দিয়ে আঁকা এক রকম ছবি আছে, দু দিক থেকে দু রকম দেখায়। একই ছবি এক দিক থেকে দেখলে হয়তো রমণীব মুখ, উল্টো দিক থেকে দেখলে ওরাংওটাং। ছবিটাকে উল্টো দিক থেকে দেখতে পেয়ে কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম আমি।

হাঁ হাঁ, আভি, তুরন্ত।

রিসিভারটা নামিয়ে অবনীশ উঠে দাঁড়ালেন। মাথার সামনের কেশবিরল অংশটায় হাত বুলিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন ডক্টর সরকার, ট্যাক্সিতেই আপনার সঙ্গে আলাপ হবে। দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে। নিখিলবাবু যখন নেই, তখন আপনাকেই ব'লে যাই, নেক্স্ট বেস্ট ম্যান।

কোথা যাবেন আপনি ?

বেশি দূর নয়, বড়বাজার। তারপর একটা হোটেল ঠিক করতে হবে আমাকে আজ রাত্রের মতন। কালই আমি ফিরে যাব, হয়তো আর দেখাই হবে না আপনার সঙ্গে।

দু হাত দিয়ে টেনে তিনি প্যাণ্টালুনটা ঠিক ক'রে নিলেন।

হোটেল কেন ?

একটু হেসে অবনীশ বললেন, আমি থাকব।

রাত্রি আসে নি? সে কোথায়?

সে ওপরে আছে, সে এখানেই থাকবে। চলুন।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে দুজনে চ'ড়ে বসলাম। ট্যাক্সিতে চ'ড়ে অবনীশ কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়ে বললেন, দেখুন, আপনার কথা শুনেছি আমি অনেক, আপনার লেখাও পড়েছি, সেইজন্যেই ভরসা করছি, আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না।

আমি একটু বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইলাম।

অবনীশ আবার বললেন, এ বাড়িতে আমি রাত কাটাতে চাই না। গাড়িতেও আমরা একসঙ্গে আসি নি, দুটো আলাদা আলাদা কম্পার্টমেণ্টে ছিলাম।

এতে আমার বিস্ময় বাড়ল দেখে তিনি একটু হেসে বললেন, আলাদা আলাদা যে ছিলাম, তার ডকুমেণ্টারি প্রমাণ রাখবার জন্যে পয়সা খরচ ক'রে ভিন্ন দুটো কম্পার্টমেণ্টে বার্থ রিজার্ভ করিয়ে এসেছি। এখানেও হোটেলে থাকতে চাই, ডকুমেণ্টারি এভিডেন্স একটা থাকবে।

ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। বললাম, এর মানে কি?

মানে কি, আপনারা ডাক্তার মানুষ দুদিনেই বুঝতে পারবেন। স্বর্ণেন্দুর বন্ধু হিসেবে যেটুকু কর্তব্য ছিল করলাম, তাকে তার আত্মীয়ের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। পূর্ণেন্দুবাবুর বর্তমান ঠিকানাটা খুঁজে সেইখানেই পৌঁছে দেবেন আপনারা, যদি দরকার মনে করেন। আমি হাত ধুয়ে ফিরে যেতে চাই।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায় ?

একটা অদ্ভুত রকম হাসি হাসলেন অবনীশ।

আহ্ আহ্ আহ্ আহ্—ঈষৎ মুখ ফাঁক ক'রে খুব আস্তে আস্তে এই শব্দটা করলেন। তারপর বললেন, আপনি জ্যোতির্ময়বাবুর কথা জানেন তা হ'লে ?

শুনেছি কিছু।

আরও শুনবেন ক্রমশ।

তাঁর কণ্ঠস্বর কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠল। ভুঁড়ো নাকের নীচে পুরু ঠোঁট দুটো কি যেন বলি বলি ক'রে চেপে গেল।

জ্যোতির্ময়বাবু কোথায় এখন ?

প্যারিসে। কিছু টাকা যোগাড় ক'রে তিনি প্যারিসে চ'লে গেছেন আর্ট-চর্চা করবার জন্যে। আর্টিস্ট লোক!

চুপ ক'রে ব'সে রইলাম আমি।

অবনীশ বড়বাজারে ট্যাক্সি থামিয়ে নানা দোকানে ঘুরলেন। একটা গলির ভেতর ঢুকে গেলেন শেষে। আমি ট্যাক্সিতেই চুপ ক'রে ব'সে রইলাম। স্টেশন-মাস্টারের ছবিটা ফুটে উঠল মনে। মনে হ'ল, চাকরির সময় ঊর্ধ্বশ্বাসে গরুর জাব-দেওয়ার মধ্যে খাঁটি দুগ্ধ-লোলুপ যে মনের পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম, আমাদের অধিকাংশের মনোবৃত্তি হয়তো ওই। জীবনের আনন্দ গৃহস্থালিতে, চাকরিতে নয়, চাকরিটা বজায় রাখতে চাই গৃহস্থালির সুবিধে হবে ব'লে। গৃহস্থালির সঙ্গে চাকরির বিরোধ যদি কোনদিন

দুরতিক্রম্য হয়ে ওঠে, তখন স্টেশন-মাস্টারকে চাকরিটাই ছাড়তে হবে, গৃহস্থালিটা নয়। সব রকম বাঁচিয়ে যদি প্রেম করা চলত, অবনীশ রাজি ছিলেন। কিন্তু নিজের সুনাম ক্ষতবিক্ষত ক'রে? এই রকম মেয়ের সঙ্গে? অবনীশ মোটেই তাতে রাজি নন। প্রয়োজন হ'লে শুধু টিকি আর নিরামিষ আহারের নজিরেই নয়, দলিলের জোরে তিনি প্রমাণ করবেন যে, রাত্রির সঙ্গে কলঙ্কজনক কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর হয় নি। তিনি নিজের ব্যবসার খাতিরে কলকাতা এসেছিলেন, বন্ধুব বোন হিসাবে ভিন্ন কম্পার্টমেণ্টে ভিন্ন বার্থে অধিষ্ঠিতা রাত্রির একটু-আধটু খোঁজখবর মাত্র করেছিলেন তিনি, আর কিছু নয়।

খানিকক্ষণ পরে অবনীশ ফিরে এলেন।

ফিরে এসে বললেন, যাক, হাজার টাকার বিজ্‌নেস হ'ল। ট্রিপটা নেহাত বৃথায় গেল না।

আমি ভদ্রতার খাতিরে সায় দিয়ে মুচকি হাসলাম।

অবনীশ নামজাদা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলেন এবং ট্যাক্সিওয়ালাটাকে ব'লে দিলেন, আমাকে যেন বেনেটোলায় পৌঁছে দেয় সে, তার জন্যে ভাড়াটাও দিলেন তাকে অগ্রিম।

গুড নাইট।

গুড নাইট।

জনতা ভেদ ক'রে ট্যাক্সি ছুটতে লাগল।

আমি চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

২

"আপনারা কি আশা করেন, বংশীর সেই কুৎসিত প্রলাপ জ্যোতির্ময় এসে শুনবে, এ সম্ভাবনা জেনেও আমি চুপ ক'রে ব'সে থাকব? আমি? কিন্তু স্টেশনে গিয়ে দেখলাম, জ্যোতির্ময়ের আসা চলবে না, সবিতার স্বপ্নে তার দুটি চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে ভাবছে সবিতাকে। এ দেখবার পরও কি আমি তাকে সবিতার বাড়ি যেতে দেবার সুযোগ দিতে পারি? তা ছাড়া সে এসেই হয়তো পুলিসের হাতে পড়ত। সবিতা, পুলিস।—কিছুতেই তাকে আসতে দিলাম না। কেমন ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম? আলেয়া যেমন ক'রে পথিকের পথ ভোলায়, বাঘিনী যেমন ক'রে অসহায় হরিণের ঘাড় মটকে তাকে অনায়াসে পিঠে ক'রে তুলে নিয়ে যায়, তেমনই ক'রে। কিন্তু তবু সে রইল না। যে হরিণটাকে মরা ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম, হঠাৎ সেটা আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে তড়াক ক'রে উঠে গহন বনে অদৃশ্য হয়ে গেল চকিতের মধ্যে।" না, রাত্রি এসব কথা বলে নি। আমি কল্পনা করেছিলাম, যেন রাত্রি বলছে। রাত্রিকে আমি এসব বিষয়ে প্রশ্নই করি নি কোনদিন। অবকাশ হয় নি ব'লে নয়, সাহস হয় নি, ভদ্রতায় বেধেছিল। তা ছাড়া লোকে প্রশ্ন করে সংশয় নিরসনের জন্যে, আমার মনে কোন সংশয় ছিল না। আর এক দল অভদ্র লোক সব জেনেশুনেও প্রশ্ন করে অপ্রস্তুত করবার জন্যে। এসব প্রশ্ন ক'রে রাত্রিকে

আমি অপ্রস্তুত করতে পারতাম কি না, জানি না; কিন্তু তাকে অপ্রস্তুত করবার বাসনাই আমার মনে হয় নি কোনদিন।

আমি কল্পনা করেছিলাম। সেদিন রাত্রে নিখিল চৌধুরীর ছাতে প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরের বিছানায় রোরুদ্যমানা রাত্রিকে দেখে অনেক রকম কল্পনা করেছিলাম আমি। মেঘ-ভারাক্রান্ত নিবিড় রাত্রি অন্ধকারে লুকিয়ে কাঁদছিল। আমি সে কান্না দেখেছিলাম, শুনেছিলাম, কেমন যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম নিজেকে। জলে বরফ যেমন গ'লে যায়, তেমনই আমার মনের জমাট সংস্কারগুলো ধীরে ধীরে গ'লে যাচ্ছিল। শ্রাবণ-শর্বরীর নিরবচ্ছিন্ন ধারা-বর্ষণ অন্তরলোকে যে নিবিড় রহস্যলোক সৃজন করে, সে রহস্যলোকের নিগূঢ় অস্পষ্টতায় যেমন বুদ্ধিবৃত্তির কোন যুক্তি চলে না, একটা সশঙ্ক উৎকর্ণ অনুভূতি অবুঝের মত রুদ্ধ-শ্বাসে অনির্দিষ্ট একটা কিছুর প্রত্যাশা করে যেমন প্রতি মুহূর্তে, তেমনই আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো অসম্ভব সম্ভবপর হয়ে উঠবে, হয়তো রাত্রি এখনই উঠে ব'সে চীৎকার ক'রে বলবে, আমি তোমাদের আইন মানি না, ধর্ম মানি না, কিছু মানি না, আমি কেবল আমাকেই মানি; আমি আছি ব'লেই তোমরা আছ, জগৎ-সংসার আছে,—আমার আমিত্বটাকে চেপে পিষে দ'লে মেরে ফেলতে দেব না, দেব না, দেব না; পারবে না তোমরা, কিছুতেই আমাকে এঁটে উঠতে পারবে না, তোমাদের সমস্ত আইন ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়ে আমি নিজেকে জাহির করবই।

কিন্তু কিছুই সে বলে নি। আলুলায়িত কুন্তলে বিছানার

ওপর উপুড় হয়ে প'ড়ে অঝোরঝরে কাঁদছিল সে। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। আমি যে দেখছিলাম, তা সে জানত না। তার দুর্বল মুহূর্তে তাকে যে একদিন দেখেছিলাম, সে কথা কোনদিন তাকে বলি নি। তার ধারণা, সম্রাজ্ঞীর মত অনুকম্পা-ভরেই সে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি যেন আমার নিজের গরজেই তার কাছে কৃপা-ভিক্ষা করেছিলাম, এবং উদারতা-চর্চা করবার সুযোগটা দিয়ে সে যেন আমাকে কৃতার্থ করেছিল। তার ভূলুণ্ঠিত সত্তার আকুল ক্রন্দন যে আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সে কথা তাকে জানিয়ে কি লাভ হ'ত আমার? তাকে শুধু ছোট করা হ'ত, সঙ্কুচিত করা হ'ত, তার পরাজিত বিধ্বস্ত অহমিকাকে নীচের মত উপহাস করা হ'ত। রাত্রিকে অপমান করবার মত কাপুরুষতা অথবা নিষ্ঠুরতা আমার ছিল না। জ্যোতির্ময়ের কথা আলাদা। সে বিশুদ্ধ শিল্পী, তাই সে স্বভাবতই নিষ্ঠুর। শিল্পীরা আলোকতীর্থের যাত্রী। যুগে যুগে তিমিরময়ী রাত্রিকে অতিক্রম ক'রে চ'লে যায় তারা। জ্যোতির্ময়কে দোষ দিই না আমি।

অবনীশের সঙ্গে রাত্রি কলকাতায় এসেছিল কেন, এ প্রশ্ন আমার মনে জেগেছিল। তখন তার কোন উত্তর পাই নি, পরে পেয়েছিলাম। রাত্রি এসেছিল দেখতে, সবিতা কলকাতায় আছে কি না। সবিতা ছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কলকাতা শহরের ট্রাম ট্যাক্সি জনতা কোলাহল, ধরণীবাবুর ছদ্ম উৎকণ্ঠা, নিখিল চৌধুরীর নির্জলা ক্রোধ, রাখালবাবুর উইল, ডি. কে.র বর্ণনা, ডাক্তারী-জীবনের সফলতা-নিষ্ফলতা, লেখক-জীবনের প্রেরণা-অবসাদ—এ সমস্ত সত্ত্বেও পাঁচটি ছবি আমার মনে আঁকা আছে, চিরকাল থাকবে বোধ হয়।

১

অন্ধকার। গড়ের মাঠের একটা নির্জন অংশে রাত্রি শুয়ে ছিল, আমি পাশে ব'সে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমরা দুজন ছাড়া পৃথিবীতে আর যেন কেউ নেই, কলকাতা শহরটা তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আকস্মিকভাবে ক্ষণিকের জন্য যেন আবির্ভূত হয়েছে, বুদ্বুদের মত এখনই মিলিয়ে যাবে। রাত্রির মনের মধ্যে ঢুকে আমি যেন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, অন্ধকার গুহার ভেতরে লোকে যেমন পথ হারিয়ে ফেলে, তেমনই। মোটরের চীৎকার মশকের গুঞ্জনের মত মনে হচ্ছিল, ক্রমশ তাও আর শোনা যাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল, চারদিকের আলো ক্রমশ যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, মুমূর্ষু রোগীর নাড়ী ক্রমশ যেমন ক্ষীণ হয়ে আসে। সমস্ত বিশ্বে যেন কিছু নেই, আছে কেবল একটা অনুভূতিময় স্পন্দন, ভেসে চলেছি যেন আমরা দুজনে—মন্থর

গতিতে, সেই স্পন্দনের তালে, তালে সময়ের স্রোতে। সময়ের গতিও যেন থেমে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, চেতনা ধীরে ধীরে অসাড় হয়ে আসছিল।…হঠাৎ তার দীর্ঘনিশ্বাসপতনের শব্দে চমকে উঠলাম। হঠাৎ কলকাতা শহর তার সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আবার মূর্ত হয়ে উঠল চতুর্দিকে। আলো অন্ধকার সব ফিবে এল। চেয়ে দেখলাম, রাত্রি শুয়ে অঘোবে ঘুমোচ্ছে।

২

দিনটা মেঘলা ছিল।

নিছক বেড়াবার জন্যেই বেরিয়েছিলাম। দ্রুতগামী একটি ট্রেনের খালি কম্পার্টমেণ্টে ব'সে ছিলাম দুজনে। মেঘেব স্তর ভেদ ক'রে যে সূর্যালোক সেদিন নেমে এসেছিল পৃথিবীতে, তা যেন আগত নয়, আসন্ন—যেন একটা অলৌকিক কিছুব পূর্বাভাষ। এলোমেলো হাওয়াটা সেদিন বইছিল যেন তার অলক আর বসনকে উতলা করবার জন্যেই। তার পবনে ছিল জবাফুলের মত লাল রঙেব একটি রেশমী শাড়ি। শাড়িব কোন পাড ছিল না। মাথায় কোন অবগুণ্ঠন ছিল না। জানলার বাইরে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে ছিল সে। লাল শাড়িতে তার সর্বাঙ্গ আবৃত, মুখটি শুধু খোলা। মনে হচ্ছিল, মহাকাশচারী কোন জ্বলন্ত নক্ষত্রের একটা টুকরো মাধ্যাকর্ষণের টানে হঠাৎ নেমে এসেছে যেন পৃথিবীতে, তার খানিকটা নিবে কালো হয়ে গেছে, বাকিটা জ্বলছে এখনও।…দু পাশে দিগন্তবিস্তৃত ডানকুনির মাঠ।

নিউ কর্ডের নূতন লাইন। দ্রুতগামী ট্রেন। গাড়িটা দুলছিল। হঠাৎ সে মুখ ফিরিয়ে চাইলে আমার দিকে, তার নির্নিমেষ চোখে একবার যেন নিমেষপাত হ'ল, কৌতুকদীপ্ত এক কণা হাসি চিকমিক ক'রে উঠল কুচকুচে কালো চোখে, ক্ষণপরেই সে হাসি সংক্রামিত হ'ল অধরে।

আপনার খুব অনুতাপ হচ্ছে, নয়?

বিস্ময়ের ভান ক'রে বললাম, না, আনন্দ হচ্ছে।

সত্যি?

ক্ষণকালমাত্র কৌতুকদীপ্ত দৃষ্টি আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ ক'রে আবার মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল সে। এলোমেলো হাওয়া উদ্দাম হয়ে উঠল তার অলকগুচ্ছে, শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে। কেন আনন্দ হচ্ছে, এ কথা সে জানতে চায় নি; কিন্তু যেহেতু আমার সত্যি সত্যি আনন্দ হচ্ছিল না, অনুশোচনাই হচ্ছিল, তাই আনন্দিত হবার একটা বিশ্বাসযোগ্য কারণ বিবৃত না ক'রে পারলাম না আমি।

আইনকে আইন দিয়েই জব্দ করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে বইকি।

আবার সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে, চেয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

আপনার আত্মীয়স্বজন? তাঁরাও কি আনন্দিত হবেন এ খবর শুনলে?

সম্ভবত হবেন না। কিন্তু তাঁদের জানাবার দরকার কি?

জীবনের অধিকাংশ আনন্দজনক কার্যই অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে করতে হয় সকলকে।

আধুনিকতার সুরা পান করেছিলাম বটে, কিন্তু এক চুমুক মাত্র। নেশার চেয়ে ক্ষোভই বেশি হয়েছিল, কিন্তু ভান করতে হচ্ছিল, যেন সত্যি সত্যি নেশা হয়েছে। নেশা যে একেবারে হয় নি, তা নয়; কিন্তু তা আধুনিকতার সুরা পান ক'রে নয়, সনাতন সুরা পান ক'রে। তার সঙ্গে আধুনিকতার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না, তা যুবতীর সম্পর্কে যুবকের আদিম নেশা। কিন্তু সে উন্মাদনাকে আধুনিকতার ছদ্মবেশে নিস্পৃহ ঔদার্যের ভূমিকা অভিনয় করতে হচ্ছিল মিথ্যা আনন্দের আতিশয্য-সহকারে।

দ্রুতগামী ট্রেন ছুটছিল। দু পাশে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠ মেঘলা দিনের স্নিগ্ধ আলোকে প্রতীক্ষা করছিল যেন কার, এলোমেলো হাওয়া পাগল হয়ে উঠেছিল তার অলকে আর লাল শাড়িতে, আমি চুপ ক'রে ব'সে দেখছিলাম, তার মখমল-কোমল কালো মুখে অনুদ্ভাসিত অপরূপ একটা অরুণিমা উদ্ভাসিত হবার সাধনা করছে।

৩

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হয়েছিল হঠাৎ আর একদিন।

রাত্রি তার বাবার কাছে যায় নি, যেতে চায় নি। তাকে আলাদা একটা বাসা ক'রে দিয়েছিলাম। বাসাটার সামনে ছোট

একটুখানি ফাঁকা জায়গা ছিল। জায়গাটার ওপারে প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়িখানা যাঁর, এই ফাঁকা জায়গাটুকুরও তিনিই মালিক। রাত্রিকে প্রায় সমস্ত দিনই আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতাম—বাসে, ট্রামে, ট্যাক্সিতে, ট্রেনে। খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল হোটেলে। শোবার জন্যেই কেবল বাড়িটা ভাড়া করতে হয়েছিল রাত্রিরই অভিপ্রায় অনুসারে। সেদিন বিকেলে রাত্রির আসবার কথা ছিল আমার ডিস্‌পেন্‌সারিতে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে রইলাম, তবু সে এল না। যে 'কল' দুটি বাকি ছিল, তা সেরে রাত্রির বাসায় গেলাম। গিয়ে দেখি, সামনের মাঠটায় অসম্ভব ভিড়। তিনতলা-বাড়ির মালিকের পিতৃশ্রাদ্ধ, কাঙালী-বিদায় হচ্ছে। অন্ধ, খঞ্জ, নানা ভাবে বিকৃত নানা বয়সের স্ত্রী পুরুষ ছেঁড়া কাপড়ে রুখু চুলে কিলবিল করছে মাঠটায়। সমস্ত স্থানটা দুঃশব্দে ও দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দেখলাম, রাত্রি মাঠের দিকের কপাট জানলা সব বন্ধ ক'রে দিয়েছে। সম্ভবত ভিড়ের জন্যে বেরোতেও পারে নি।

কড়া নাড়তেই চাকরটা এসে কপাট খুলে দিয়ে গেল। ওপরে উঠে দেখলাম, রাত্রি পড়ছে। আমার কাছে নানা রকম মাসিকপত্র জ'মে ছিল, তারই এক বোঝা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম তাকে।

আজকাল সাহিত্য-সমাজেও খুব দলাদলি, নয়?

প্রশ্নটার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, তবু একটা উত্তর দিলাম।

হবে না কেন? মানুষ, বিশেষত সাহিত্যিকেরা স্বাধীন-

বুদ্ধিসম্পন্ন জীব। প্রত্যেকেরই স্বাধীন মত আছে এবং তা প্রকাশ করবার অধিকার আছে। সুতরাং দলাদলি তো হবেই।

আপনি কি বলতে চান, স্বাধীন মতের প্রতি নিষ্ঠার জন্যেই এত দলাদলি? আমার তো নানা কাগজের নানা প্রবন্ধ প'ড়ে মনে হ'ল যে, সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা কারও নেই, সকলেই মতলববাজ ব্যবসাদার।

এ রকম মনে হওয়ার মানে?

মানে, যিনি লিখছেন দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে যতক্ষণ না সাহিত্য গঠিত হচ্ছে ততক্ষণ তা খাঁটি সাহিত্য নয়, তিনি নিজে হয় প্রকাশক, কিংবা কোন প্রকাশকের বন্ধু, এবং তাঁর আসল উদ্দেশ্য—দরিদ্র জনসাধারণকে নিয়ে লেখা কোন পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেওয়া। আবার এই দেখুন, আর একটা কাগজে দেখছি, একটা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়—গণসাহিত্য এখনও সৃষ্টি হয় নি এ দেশে। এঁর সঙ্গে বোধ হয় প্রথম প্রবন্ধ-লেখকের শত্রুতা আছে। আর একটা কাগজ প্রগতি-সাহিত্য নিয়ে মাতামাতি করছেন, এঁরও উদ্দেশ্য—

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, আহা, এরা সবাই যে মতলববাজ, এ সন্দেহ হ'ল কি ক'রে তোমার? ওসব প্রবন্ধে যে যুক্তি আছে, সেগুলো কি অর্থহীন?

একটু হেসে রাত্রি বললে, বুদ্ধিমান লোকে যে কোন জিনিসের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অনায়াসে একটা যুক্তি খাড়া করতে পারে, ভাল উকিল দোষীকেও মাঝে মাঝে বেকসুর খালাস করিয়ে

আনে, তাই ব'লে সত্য মিথ্যা হয়ে যায় না। যারা মানুষকে ভালবাসে, তারা যেমন মানুষের জাতবিচার করতে বসে না, তেমনই যারা সত্যিকার সাহিত্যরসিক, তারা সাহিত্যের জাত নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের সুখ দুঃখ প্রেম ঘৃণা আশা আকাঙ্ক্ষা অর্থাৎ মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্য। সে মানুষ ধনী কি গরিব, রাজরাণী কি মেথরানী—এ নিয়ে যারা বেশি মাতামাতি করে, তারা জানবেন চণ্ডীমণ্ডপবাসী ঘোঁট-পাকানো মতলববাজ চাঁইদের সগোত্র। তারা ব্যবসাদার, সাহিত্যিক নয়।

ওয়েটিং-রূমে রাত্রির সঙ্গে সাহিত্য-আলোচনা হবার পর আর সাহিত্যপ্রসঙ্গ তার কাছে তোলবার সাহস ছিল না আমার। মাসিকপত্রগুলো তার কাছে এনে দিয়েছিলাম অবশ্য ক্ষীণ একটা আশা নিয়ে। সাহিত্যবিষয়ক দু-চারটে প্রবন্ধ ইদানীং লিখেছিলাম এবং প্রোলিটারিয়েট সাহিত্য নিয়েই লিখেছিলাম। রাত্রির মুখে এই মন্তব্য শুনে আমি মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলাম, আমাব ওই লোক-ভোলানো সস্তা উচ্ছ্বাসগুলো ওর চোখে যেন না পড়ে। কোন অজুহাতে মাসিকগুলো সরিয়ে নিয়ে যাব আমি এখান থেকে।

জ্যোতির্ময়েব যে ছবিখানা এন্‌লার্জ করতে দিয়েছিলাম, সেটা হয়েছে ?

কবে দেবার কথা ছিল ?

আজই।

চল, তবে বেরোনো যাক।

ওই নোংরা ভিড় ঠেলে আমার আজ বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না, আপনিই গিয়ে নিয়ে আস্থন।

তার আদেশ—হ্যাঁ, আদেশই—অগ্রাহ্য করবার মত মানসিক শক্তি আমার ছিল না। সে আদেশ করবে না কেন, কিছুই সে লুকোয় নি, জ্যোতির্ময়ের সম্বন্ধে কোন কথাই সে আমার কাছে গোপন করে নি। সমস্ত জেনেশুনেই আমি তাকে—না, ভুল বলছি—আমি তাকে প্রশ্রয় দিই নি, সে-ই আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। আমি সব জেনেশুনেও অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম, সে তা গ্রহণ ক'রে কৃতার্থ করেছিল আমাকে। আদেশ করবে না কেন?

বেরিয়ে এলাম। ভিড় ঠেলে রাস্তায় গিয়ে পড়লাম অনেক কষ্টে। গলির বাঁকে অদৃশ্য হবার পূর্বে ঘাড় ফিরিয়ে যে ছবিটা দেখলাম, তা আমার মনে স্পষ্টভাবে আঁকা আছে এখনও। দোতলার বারান্দায় নির্বিকারভাবে রেলিঙে ভর দিয়ে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পায়ের নীচে অসংখ্য ভিখারী।

৪

টেলিফোনের ঝনৎকারে ঘুম ভেঙে যখন উঠে বসলাম, তখন রাত দুটো। কলকাতা শহরও তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার শোবার ঘরের জানলা দিয়ে যে আকাশটুকু দেখা যায়, তাতে সহসা বিদ্যুতের চমক দেখতে পেলাম। সোঁ-সোঁ ক'রে একটা হাওয়া উঠল। সেদিন সমস্ত দিন রাত্রির সঙ্গে দেখা হয় নি।

বিকেলে গিয়েছিলাম, দেখা পাই নি, একাই সে কোথায় বেরিয়েছিল। মনে হ'ল, রাত্রিই হয়তো ফোন করছে কোথাও থেকে। গোকুল এসে বললে, নবীনবাবু—

নবীনবাবু লোকটি কে, ভাববার চেষ্টা করলাম। রোগীদের নাম আর পেটেণ্ট ওষুধের নাম মনে রাখা এমন এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! অথচ এই দুটি জিনিসই আমাদের পেশার পক্ষে অপরিহার্য। সহসা মনে পড়ল, নবীনবাবু পূর্ণেন্দুবাবুর মামাতো ভাইয়ের নাম। নেমে এলাম বিছানা থেকে। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টিও নামল, হাওয়ার বেগ বাড়ল।

ফোনে নবীনবাবু বললেন, দাদা কেমন যেন করছেন, আপনি দয়া ক'রে শিগগির আসুন একবার।

রাত দুটোর সময় যেসব রোগী 'কেমন যেন করে', তাদের অনেকের কথা জানি, কারও বেলাতেই দয়া করতে ত্রুটি করি নি, কিন্তু—। মনের ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ সুরটা সহসা ভোঁতা হয়ে গেল, যখনই ভাল ক'রে মনে পড়ল, পূর্ণেন্দুবাবু স্বর্ণেন্দুর বাবা।

তাড়াতাড়ি জামা জুতো প'রে স্টেথোস্‌কোপ আর ব্যাগটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম—হঠাৎ যদি কোন ট্যাক্সি পাওয়া যায়, এই ভরসায়। কলকাতা শহরেও অত রাত্রে যান-বাহন সুলভ নয়। ফুট্‌পাথ দিয়ে জোরেই হাঁটতে লাগলাম। বিরাট কর্নওয়ালিস স্ট্রীট জনশূন্য। টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, হাওয়া বইছিল বেশ জোরে। রাত্রির কথা মনে পড়ল। বিশেষভাবে আরও এইজন্যে মনে পড়ল যে, এসে

থেকে রাত্রি পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে যায় নি। কেন যায় নি, এ প্রশ্ন তাকে করেছিলাম। উত্তরে সে যা বলেছিল, তা নিখিল চৌধুরীর কাছে হয়তো সন্তোষজনক ব'লে মনে হতে পারত, কিন্তু আমার কাছে অসম্পূর্ণ ব'লে মনে হয়েছিল। বলেছিল, গেলে উনি হয়তো দাদার কথা জানতে চাইবেন ; কিন্তু বলার ধরনে কেমন যেন একটা কপটতা ছিল। এ কপটতার কারণ যে কি, তার আভাস আমার অজ্ঞাত ছিল না ; অবশ্য তা আভাস মাত্র। রাত্রি এ বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কেন যে দেয় নি, সেই কথাই ভাবতে ভাবতে চলেছিলাম। কতক্ষণ যে চলেছিলাম, তা ঠিক মনে নেই, শুধু মনে আছে, টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, ফাঁকা ফুট্‌পাথ দিয়ে রাত্রির কথা ভাবতে ভাবতে একা হেঁটে চলেছিলাম।

শাঁখারিটোলায় নবীনবাবুর বাসায় যখন পৌঁছলাম, নবীনবাবু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, কেমন যেন নিঝুম হয়ে পড়েছেন। ঘরের ভেতর ঢুকে দেখলাম, জীবন্ত চোখটাও মিনতি করছে ; যাঁর ঘুম হ'ত না, মহানিদ্রা নেমেছে তাঁর চোখে, সমস্ত মুখমণ্ডলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছে। পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেছেন।

ফেরবার সময় একটা ট্যাক্সি পেলাম। মনে হ'ল, রাত্রিকে খবরটা দিয়ে যাওয়া আমার কর্তব্য। রাত্রির বাসায় পৌঁছে বিস্মিত হয়ে গেলাম। রাত্রি তখনও জেগে আছে। জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখনও টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, জোরে হাওয়া

বইছিল, গলির মোড়ে অপেক্ষমান ট্যাক্সিটার হেড-লাইটের আলো নিঃশব্দে অন্ধকারকে বিদীর্ণ করছিল, আমি রাত্রির জানলার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাত্রি এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে আছে কেন? মুহূর্তের মধ্যে সম্ভব অসম্ভব নানা কারণ মনের মধ্যে ভিড় ক'রে এল, চ'লে গেল। কড়া নাড়লাম।

রাত্রি জানলায় উঠে এল।

কে?

আমি।

আপনি এত রাত্রে?

চাকরটাকে না জাগিয়ে নিজেই নেমে এসে দরজা খুলে দিলে।

এত রাত্রে হঠাৎ যে?

ওপরে চল, বলছি। তুমি এখনও জেগে আছ কেন?

চিঠি লিখছিলাম।

কাকে?

ফার্নান্ডিজকে।

এমন সহজভাবে বললে, যেন ফার্নান্ডিজকে আমি চিনি আর সে কথা ও জানে। নিমেষের মধ্যে মানসপটে অনেকদিন আগেকার একটা ছবি ফুটে উঠল—কলুটোলার মোড়ে স্বর্ণেন্দু, তার হাতে খবরের কাগজে মোড়া টকটকে লাল খাপে ঢাকা ছোরা, রাত্রির জন্মদিনে ফার্নান্ডিজের উপহার।

যেন কিছুই জানি না, এমনই ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, ফার্নান্ডিজ কে?

ফার্নান্‌ডিজ আমাদের ড্রাইভার ছিল। আমাদের পুরোনো বাসাটার খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম আজ বিকেলে, সেখানে দেখলাম, আমার নামে ফার্নান্‌ডিজের একটা চিঠি রয়েছে আর এই ফোটোখানা।

টেবিলের ওপরেই ফোটোখানা রাখা ছিল। দীর্ঘদেহ বলিষ্ঠ-গঠন একজন হাবসী। ছবিটার দিকে চেয়ে রইলাম নির্নিমেষে।

হঠাৎ জানলা দিয়ে দমকা একটা হাওয়া ঢোকাতে চিঠি লেখবার প্যাডেব পাতাগুলো ফরফর ক'রে উড়তে লাগল। দেখলাম, রাত্রি ফার্নান্‌ডিজকে দীর্ঘ পত্র লিখেছে। কি লিখেছিল, আমি দেখি নি। রাত্রি একটা বই নিয়ে প্যাডটার ওপর চাপা দিলে।

বললাম, পূর্ণেন্দুবাবু মারা গেলেন এখুনি।

বাত্রি শুনে নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

তাবপর অনেকক্ষণ পরে বললে, শান্তি পেলেন এতদিনে।

একটুও কাঁদলে না।

তারপর হঠাৎ বললে, আচ্ছা, একটা সুটকেস আপনাব বাসায় রেখে গিয়েছিলাম সেবারে, সেটা আছে তো?

আছে।

কাল নিয়ে আসতে হবে সেটা।

আচ্ছা।

পরস্পবের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। বাইরে টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়তে লাগল, জোবে জোরে হাওয়া বইতে লাগল, প্রকাণ্ড ট্যাক্সিখানা নীরবে অপেক্ষা ক'রে রইল নীচের গলিটাতে খানিকটা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মত।

সিনেমায় ভাল একখানা বই ছিল।

সকাল থেকেই কাজকর্ম এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলাম, যাতে সন্ধ্যাবেলায় অবসর থাকে। পাশাপাশি দুখানা সীট আগে থেকে 'বুক' ক'রে রেখেছিলাম। যথাসময়ে রাত্রির বাসায় গিয়ে কড়া নাড়লাম। কোন সাড়া পেলাম না। হাতঘড়িটা দেখলাম, আর মাত্র আধ ঘণ্টা দেরি আছে। ট্যাক্সি ক'রে না গেলে সময়ে পৌঁছনো যাবে না। আবার কড়া নাড়লাম, এবার একটু জোরে জোরে। ছোঁড়া চাকরটা নেমে এল। কবাট খুলে দিয়ে বললে, মায়ের অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে? তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। সামনের ঘরে কাউকে দেখতে পেলাম না। ডাকলাম, সাড়া পেলাম না। শোবার ঘরে ঢুকে দেখলাম, সেখানেও কেউ নেই। আবার ডাকলাম, সাড়া নেই। এদিক ওদিকে খুঁজে শেষে বাথ-রুমের পাশে অন্ধকার ছোট যে ঘরটা ছিল, সেই ঘরটায় ঢুকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ঘরটার অন্ধকার কোণে রাত্রি উপুড় হয়ে প'ড়ে ছিল। প্রসব-বেদনাতুরা রাত্রি। কাঁদছিল না, কাঁপছিল না, নিয়তির কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিয়ে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে প'ড়ে ছিল। আমিও নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। রাত্রি আমার পদশব্দ শুনতে পেয়েছিল। বেশবাস সম্বৃত ক'রে আস্তে আস্তে উঠে বসল, তারপর আমার মুখের দিকে নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ ক'রে সহজ কণ্ঠে বললে, আজ হবে। আমি আরও ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আমাকে ডাক্তারী বিবেকের তাড়নায় ছুটে বেরিয়ে আসতে হ'ল। যে ধাত্রীটিকে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, তারই উদ্দেশে ছুটতে হ'ল ট্যাক্সি নিয়ে।

রাত্রি বারোটার পর নির্বিঘ্নে রাত্রির সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল।
আমি তার নামকরণ করলাম, প্রভাত।

দশম পরিচ্ছেদ

এর পর যেসব বর্ণনা গল্পলেখকের লেখনীতে অনর্গলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী, সেসব বর্ণনা আমি করব না। বসন্তের যাদুস্পর্শে শুষ্ক তরু যেমন মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, অদৃশ্য শক্তির লীলায় পাথর বিদীর্ণ ক'রে যেমন নির্ঝর নিঃসৃত হয়, বর্ষাসমাগমে শীর্ণ স্রোতস্বতী যেমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে দু কূল প্লাবিত ক'রে ছোটে, সন্তান লাভ ক'রে রাত্রিরও মাতৃহৃদয় তেমনই— এই জাতীয় বর্ণনা রাত্রির সম্পর্কে আমি করতে পারব না, কারণ তা মিথ্যা হবে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি, সন্তান প্রসব ক'রে রাত্রি মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে নি, নির্ঝরের চপলতা লাভ করে নি, নদীর মত দু-কূলপ্লাবিনী হয় নি। রাত্রি কেমন যেন শুকিয়ে গিয়েছিল, কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল, তার নির্ভীক সত্তা কেমন যেন নির্জীব হয়ে এসেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, একটা আকাশচারী ব্যোমযানকে কে যেন গুলি ক'রে মাটিতে নামিয়ে এনেছে। তার চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা ফুটে উঠেছিল, তাতে মাতৃহৃদয়ের স্নিগ্ধতা ছিল না, ছিল শরাহত ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের মৌন বিলাপ। তার সারাদিন শান্তি ছিল না, সারারাত ঘুম ছিল না। ওই মাংসপিণ্ডটার প্রতি মুহূর্তের অসংখ্য দাবি মেটাবার জন্যে অহরহ তাকে যে প্রাণপাত করতে হ'ত, তার মধ্যে মহনীয় কিছু আমি দেখতে পাই নি। আমার মনে হ'ত, অমোঘ আইনের কবলে প'ড়ে সে যেন সশ্রম কারাদণ্ড

ভোগ করছে। তার মলিন মুখ, শঙ্কিত দৃষ্টি, শীর্ণায়মান দেহ, অন্তরের নিদারুণ গ্লানি সত্ত্বেও বাইরের ছদ্ম-সপ্রতিভতা—না, মহনীয় কিছুই ছিল না।

প্রভাত কি তার মায়ের বন্দীত্বের ব্যথা অনুভব করেছিল? আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, করেছিল। শিশুকে আমরা যত অবোধ ভাবি, হয়তো সে সত্যিই তত অবোধ নয়। আমার মনে হয়, প্রভাত তার মায়ের ব্যথা বুঝেছিল, কোন নিগূঢ় উপায়ে বুঝেছিল, তাই সে তার মাকে মুক্তি দিয়ে চ'লে গেল। তা না হ'লে অমন সুন্দর সুস্থ শিশুর হঠাৎ মৃত্যু হ'ল কেন?

অসুস্থ হয়ে পশ্চিমের এই শহরটায় বায়ু-পরিবর্তনের জন্যে এসে স্মৃতি-মন্থন ক'রে যে কাহিনী আমি লিপিবদ্ধ করছি, এখন মনে হচ্ছে, তার কতটুকু আমি জানি! সবই তো অস্পষ্ট। কল্পনায় বাস্তবে, আলোয় আঁধারে মিলিয়ে যে ছবি আমি আঁকলুম, তার কতটুকু কল্পনা, কতটুকু বাস্তব, কতটুকু আলো, কতটুকু আঁধার, কিছুই তো জানি না—সমস্তটাই আমার মনের বিকার কি না, কে জানে। সবই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু একটা অবিসংবাদিত সত্যকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না, আমি মোহগ্রস্ত। মোহের মায়াময় অঞ্জন চোখে লাগিয়ে হয়তো আমি কুৎসিতকে সুন্দর, পাপকে পুণ্য, অসত্যকে সত্য রূপে দেখেছি এবং অপরকে দেখাতে চেষ্টা করেছি। বর্তমান যুগের এই সর্বনাশা মনোবৃত্তি হয়তো আমাকেও পেয়ে বসেছে। অন্যায়কে অন্যায় জেনেও, নিজের দুর্বলতার জন্যে লজ্জিত না হয়ে তাকে সুন্দর ক'রে আঁকবার চেষ্টা করেছি কেবল আমার লেখবার শক্তি আছে ব'লে। বুঝছি, কিন্তু নিরস্ত হতে পারছি না।

তেতলার একটা ঘরে ব'সে লিখছি। দূর দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, ও-পাশের সাদা স্তূপ মেঘটার সর্বাঙ্গে অভ্র-আবীর। সারি সারি পাখি উড়ে চলেছে, দলে দলে গরু ফিরে আসছে মাঠ থেকে, নদীপারের তালবনে সোনার স্বপ্ন নেমেছে যেন, তালবনের ওপারে ঘননীল মেঘটার গায়ে আলোর জরি জ্বলছে।

ডি. কে.র কথাগুলো মনে পড়ছে।

"তাঁরা দুজনে পাপ-পুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।"

হিমালয়ের পথে রাখালবাবু আর স্বর্ণেন্দুর মায়ের সঙ্গে ডি. কে.র নাকি দেখা হয়েছিল। আলাপও হয়েছিল। ডি. কে. জানত না যে, আমার সঙ্গেও তাঁদের আলাপ ছিল। তাই সে কলকাতায় ফিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাঁদের গল্প করছিল আমার কাছে।—

আশ্চর্য লোক ভাই রাখালবাবু, নিজের ভ্রষ্টা স্ত্রীকে ভ্রষ্টা জেনেও একদিনের জন্যে ত্যাগ করেন নি।

আমি নীরবে শুনে যাচ্ছিলাম, কিছু বলি নি, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিতে, ভ্রূর কুঞ্চনে বোধ হয় বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

বিশ্বাস হচ্ছে না তোর? তুই ভাবছিস, আমি কেমন ক'রে জানলাম? রাখালবাবুর স্ত্রীই নিজে আমাকে বলেছিলেন একদিন। কেদার-বদরির পথে একটা চটিতে ছিলুম আমরা। অদ্ভুত জ্যোৎস্না উঠেছিল সেদিন। হঠাৎ রাখালবাবুর স্ত্রী কেমন যেন ক্ষেপে গেলেন। চুল এলো ক'রে, চোখ বড় বড় ক'রে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার ভাই! হঠাৎ আমাকে বললেন, না, আমি পাপের বোঝা বুকে নিয়ে কেদারনাথে যেতে পারব না, ফেটে

ম'রে যাব ; তুমি শোন, তোমার কাছে ব'লে হালকা হই আমি। এই ব'লে বলতে লাগলেন, আমার জ্যোতির্ময় যখন এক বছরের, সেই সময় পূর্ণেন্দুবাবু ব'লে একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমাদের, আলাপ ক্রমশ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হ'ল। ঘনিষ্ঠতা শেষটা এমন দাঁড়াল যে, নিজের পেটের ছেলেকে ফেলে রেখে আমি পালিয়ে গেলাম তার সঙ্গে। পূর্ণেন্দুবাবুর কাছে অনেকদিন ছিলাম, অনেকে আমাকে পূর্ণেন্দুবাবুর স্ত্রী ব'লেই জানে—

এই সময় ফোনটা ঝনঝন ক'রে বেজে উঠেছিল, ধীরেনকেই কে যেন ডাকছিল ফোনে—জরুরি দরকারে। ধীরেন গল্পটা অসমাপ্ত রেখেই চ'লে গিয়েছিল, ব'লে গিয়েছিল, আর একদিন এসে বাকিটা বলবে। এখনও ফেরে নি। শুনেছি, সঙ্গী পেয়ে সে দক্ষিণভারত ভ্রমণে গেছে। মানস-সরোবরে যেতে পারে নি ব'লে সক্ষোভে গোড়াতেই রাখালবাবুদের সম্বন্ধে যে কথাগুলো সে বলেছিল, সে কথাগুলোই বার বার মনে পড়ছে আমার—তাঁরা দুজনে পাপপুণ্যের সমস্ত বোঝা ফেলে রেখে মানস-সরোবরের উদ্দেশ্যে চ'লে গেলেন ! আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, তাঁরা দুজনে চড়াই ভাঙতে ভাঙতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উত্তর দিকের পালক-মেঘগুলোতেও রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে, দেখতে দেখতে সব গোলাপী হয়ে গেল। তালবনের ওপারের ঘননীল মেঘটা বেগুনী হয়ে আসছে ক্রমশ, আলোর জরিতে আগুন জ্বলছে। একটা পাঁশুটে রঙের মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে, আলোর ফিনিক ছুটছে তার চারদিক দিয়ে।

নিখিল চৌধুরী যেদিন রাখালবাবুর উইলটা আমাকে এনে দেখিয়েছিলেন, সেদিনের কথাও মনে পড়ছে আমার আজ।

রাখালবাবু মহাপ্রস্থানে যাবার আগে একটা উইল ক'রে নিখিল চৌধুরীর নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তিনি জ্যোতির্ময় আর রাত্রিকে সমান ভাগে ভাগ ক.. দিয়েছিলেন। পূর্ণেন্দুবাবুর জন্যেও ব্যবস্থা ছিল—তিনি যতদিন বাঁচবেন, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবার মতন খরচ পাবেন। পূর্ণেন্দুবাবুর মৃত্যুসংবাদ তিনি পান নি বোধ হয়। নিখিলবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলেন, রাত্রির ঠিকানা আমি জানি কি না। ঠিকানা আমি জানতাম না, তাই বলতে পারি নি। প্রভাতের মৃত্যুর দুদিন পরেই রাত্রি চ'লে গিয়েছিল। কোথায়, তা আমি জানি না।

আজও কিন্তু আমি তার প্রতীক্ষা করি। অসামাজিকভাবে নয়, সামাজিক দাবিতেই। আইনের চক্ষে আমি তার স্বামী। জ্যোতির্ময়ের সন্তানের জারজ-অপবাদ-মোচনের জন্য আইনত আমি তাকে বিবাহ করেছিলাম। আমি জানি, সে আসবে না। এও আমি জানি, আমার জন্যে নয়, নিজের সন্তানের জন্যেই এবং হয়তো আমার প্রবল আগ্রহাতিশয্যে এ বিবাহে সে সম্মত হয়েছিল। আমাকে সে কোনদিনই ভালবাসে নি।

তবু তার প্রতীক্ষা করি।

দূর দিগন্তরেখায় তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তপন ধীরে ধীরে নামছে। অস্তরাগরঞ্জিত মেঘমালার বর্ণ-বৈচিত্র্য নিষ্প্রভ হয়ে আসছে ক্রমশ। অন্ধকারের আগমনী শুনতে পাচ্ছি।

রাত্রি আসন্ন।

শেষ